Vol. 45 | No. 3 | 2002

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাঙালা ভাষায় আরবী-ফারছী-উরদু শব্দের সংস্কৃতায়ন ও তার পরিণাম

Volume	45
Issue	3
Year	2002
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	ড. এস, এম, লুৎফর রহমান
Published online	June 1, 2002
DOI	10.62328/sp.v45i3.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v45i3.1
Pages	৫-৫১
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাঙালা ভাষায়
আরবী-ফারছী-উরদু শব্দের সংস্কৃতায়ন
ও তার পরিণাম

ড. এস, এম, লুৎফর রহমান

বাঙালা ভাষায় আরবী, ফরছী ও উরদু শব্দের 'সংস্কৃতায়ন' ব'লতে কি বোঝায়, তা আগেই খোলাছা ক'রে বলা দরকার। কারণ 'ভাষাকে সংস্কৃতায়িত' করা; আর 'শব্দকে সংস্কৃতায়িত' করা এক নয়। 'বাঙালা ভাষা'কে সংস্কৃতায়িত করার অর্থ বাঙালা বাক্যে বিপুল সংস্কৃত বা সংস্কৃত থেকে তৈরী শব্দের আমদানী; আর তার সাথে 'সংস্কৃত পদ-গঠন রীতি' ও বাক্‌রীতি ব্যবহার। বল্‌কে (কিন্তু) 'শব্দ'কে 'সংস্কৃতায়িত' করার অর্থ শব্দের গায়ে 'সংস্কৃত পোষাক' পরানো। তার অর্থ অনুস্বার, বিসর্গ ও চন্দ্রবিন্দু যোগ করা। অথবা শব্দের চালু বা মূল রূপটির বানান বদল করা। এ-বদল অনেক রকম হ'তে পারে। তবে, বাঙালা ভাষায় হাল আমলে যে-সব আরবী, ফারছী ও উরদু শব্দের 'সংস্কৃতায়ন' করা হ'য়েছে, সে-সব শব্দে অনুস্বার, বিসর্গ, চন্দ্রবিন্দু যোগ করার চেয়ে পাঁচ–ছ'শ বছরের চালু সর্বজন-স্বীকৃত বানানকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে করা হ'য়েছে বিকৃত। কেন শব্দ নিয়ে এই বিকৃতি-সাধন বা 'বিকৃতির সংস্কৃতায়ন' তা জানা জরুরী। কারণ সংস্কৃতায়ন ব'লতে যে পরিচ্ছন্নতার ধারণা মনের মধ্যে জেগে ওঠে, শব্দের সংস্কৃতায়ন তার ঠিক উল্টো। পরিচ্ছন্নকে, অপরিচ্ছন্ন করা; সহজকে কঠিন করা; কোমলকে কর্কশ করা; স্বাভাবিক উচ্চারণকে নষ্ট, বিঘ্নিত বা অন্য রকম করাই 'শব্দের সংস্কৃতায়ন'বা 'বানানের সংস্কৃতায়ন'। যেমন 'কলম'—শব্দটার সংস্কৃত রূপ—''কলমঃ'', 'ছুলতান'—শব্দের সংস্কৃত রূপ—''সুরত্রান'', ''আরবী''—শব্দের সংস্কৃত রূপ—''মারবীং''।

কেন এই সংস্কৃতায়ন?

বলা দরকার যে, কোন কিছুই আপনা-আপনি সাহিত্য-সংস্কৃতির বুকে ফুটে ওঠে না। ভাষা-বানানের ক্ষেত্রেও নয়। সেজন্য বাঙালা ভাষায় নিহিত এ-কালের আরবী, ফারছী ও উরদু শব্দের বানানের সংস্কৃতায়ন ও আপনা-আপনি ঘটেনি। তা ঘটানো হ'য়েছে। এই ঘটানোর মূলে যে-একটি বিশেষ ধর্মীয় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্য ছিল—তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ-বিষয়ে সচেতন, অনেকেই জানেন—এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং আছেন যাঁরা কখনও কোথাও সহজ, সরল, স্বাভাবিক কোন কিছুর ধার ধারেন না। এমন অস্বাভাবিকতা তাঁদের লিপি, শব্দ, বাক্য, সাহিত্য, ব্যাকরণ, ওগয়রহে তো আছেই; সেই সাথে তা আছে — সামাজিক জীবন-জীবিকা, আচার-আচরণেও। এমনকি, ব্রাহ্মণের ঘরে যে-ছেলেটি এই মাত্র পয়দা হ'ল— সেই মাছুম বাচ্চাটিরও ঐ স্বাভাবিক জন্মটির কোন ইজ্জৎ নেই; যত দিন তক সে, কিশোর বয়সে পা না-রাখে এবং 'জাত-সংস্কার' গ্রহণ করে; পৈতা না পরে, কানে পুরোহিতের মন্ত্র না নেয়; ততদিন সে থাকে জাত-বহির্ভূত; অ-দ্বিজ বা অব্রাহ্মণ। পুরোহিতকে দিয়ে জাত-সংস্কার বা বিশেষ রকম জাতকর্ম করাবার পর-ই সে হয় 'দ্বিজ'। তার অর্থ দোছরা জন্ম-গ্রহণকারী। দ্বিতীয়জ।

ব্রাহ্মণদের এ-নিয়ম কেবল আপন আওলাদের বেলায় নয়; আপন শ্রেণীর (বর্ণের) ভাষার বেলায়ও দেখা যায়। তাই তাঁদের স্বাভাবিক ভাষায় চলে না। তাঁদের জন্য চাই অস্বাভাবিক ভাষা। 'সংস্কার' করা ভাষা। 'সংস্কৃত' ভাষা। তাঁদের ঐ ভাষার লিপি বিদ্‌ঘুটে, শব্দ উৎকট, উচ্চারণ দুর্ঘট। লেখন-তর্‌তিবও দুষ্কর। সংস্কার ক'রে তৈরী করা সংস্কৃত ভাষার এই জাত-কর্মটি ভারতীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা কেবল সংস্কৃতেই সীমাবদ্ধ রাখেননি; তাঁরা বৃটিশ আমলে নব-ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরুত্থানের সুযোগে, ১৮০১ সাল থেকে ১৯৫০ সাল তক; তার আওতায় এনেছেন—বাঙালা. হিন্দী, মালয়ালম ও আপরাপর ভারতীয় ভাষাও।

বৃটিশ আমলে, যে-বিশেষ কারণে ভারতীয় ব্রাহ্মণরা নানা প্রাদেশিক ভাষা নানা রকমে সংস্কার করার উদ্যোগ নেন, তার উদ্দেশ্য ছিল—ইংরেজদের সহায়তায় আর্যত্বের নব বর্ণগর্বী মনোভাব তৈরী এবং ইছলাম ধর্ম, ইছলামী ভাষা (আরবী, ফারছী, উরদু) ও মুছলিম জনগণের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্যবাদী কালচারাল অভ্যুত্থান সৃষ্টি। এর ফলে ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান ও ভারতীয় চিন্তা-নায়করা এক জোট হ'য়ে আর্য-ধর্ম, আর্য-ভাষা ও আর্য-জনগণের শ্রেষ্ঠত্ব এত উচ্চ কণ্ঠে প্রচার ক'রতে থাকেন যে, তার কাছে আর সব-ই তুচ্ছ হ'য়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয়

ব্রাহ্মণগণ নতুন ভাবে প্রচার করেন,—'সারা দুনিয়ায় দু'টি ধর্ম, দু'টি ভাষা ও দু'টি জাতি র'য়েছে'। সেই দুই ধর্মের একটি—আর্য-ধর্ম, অপরটি—অনার্য-ধর্ম; একটি—আর্য-ভাষা, অপরটি—আনার্য-ভাষা; একটি—আর্য-জাতি, অপরটি—আনার্য-জাতি। কেবল তাই নয়; এই দুই ধর্ম, ভাষা ও জাতির মধ্যে 'যা-কিছু আর্য' তা-ই শ্রেষ্ঠ; আর 'যা-কিছু অনার্য' তা-ই নিকৃষ্ট। তাঁদের মতে অনার্য ধর্ম মাত্রই 'দুষ্টধর্ম' (দুষ্টমত)। অনার্য ভাষামাত্রই প্রাকৃত (ইতর) ভাষা। আর অনার্য জনকওম-মাত্রই অন্ত্যজ বা ইতর-মেথর। তাই তাদের ধর্ম, ভাষা, শব্দ, লিপি সব কিছুই—হয়, এড়িয়ে চ'লতে হবে; নয়তো, সংস্কার ক'রে নিতে হবে।'

উনিশ-বিশ শতকের ভারতীয় ব্রাহ্মণদের তরফে যেহেতু অন্-আর্য—ধর্ম, ভাষা, শব্দ, সাহিত্য প্রভৃতি একেবারে এড়িয়ে চলা সম্ভব ছিল না এবং সারা উপমহাদেশে শত শত বছরের ইছলামী শাসন আচণ্ডাল-ব্রাহ্মণদের আরবী, ফারছী ও উরদু ভাষা; বাক্য, শব্দ, বানান, উচ্চারণ ও লিপি ইত্যাদি দিয়ে শক্ত ভাবে পেঁচিয়ে বেঁধে ফেলেছিল; তাই তাঁদের পক্ষে ঐ সব 'আনার্য' ভাষা, শব্দ প্রভৃতি পুরোপুরি ছুঁড়ে ফেলে দেয়া সম্ভব ছিল না। এজন্য তাঁরা পথ ধরেন—পরিবর্তনের বা সংস্কারের। তাঁরা তাঁদের তরফে, না-পাক ভাষাগুলো পাক ক'রতে—পহেলা শব্দ-সংস্কার, পরে 'লিপি-সংস্কার' এবং তারও পরে 'বানান-সংস্কারে' রত হন। উপ-মহাদেশের অপরাপর ভাষার মত বাঙালা ভাষার সংস্কার-কর্মেও এই পথ-পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়।

'গৌড়ীয়' (বর্তমান ভারতীয় বাঙালা বা পশ্চিম বঙ্গ) ব্রাহ্মণরা ১৮০১ সাল থেকে পহেলা বাঙালা ভাষার 'শব্দ-সংস্কার' শুরু করেন; তারপর লিপি-সংস্কার এবং আরও পরে বানান-সংস্কারে রত হন।

বাঙালা ভাষায় আরবী, ফারছী ও উরদু শব্দের বানান-পরিবর্তনে রবীন্দ্রনাথ-ই পহেলা উদ্যোগ নেন। তার পর একাজে এগিয়ে আসেন বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "সহজ পদ্ধতি"র নববিধি

বলা দরকার যে, বিশ শতকের বিশের দশক থেকেই বাঙালায় চালু আরবী, ফারছী শব্দের বানান-বদলের সচেতন চেষ্টা অল্প অল্প শুরু হয়। তারপর তা ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ"-এর দ্বারা বিধিবদ্ধ রূপে শিক্ষা, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সাহিত্যকর্মে ছড়িয়ে পড়ে। বহু ভাষাবিদ্ মহা

বিদ্বান ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর ঐ ব্যাকরণে আরবী, ফারছী ভাষায় রাখা মুছলমানদের নাম-লেখার সমস্যা নিয়ে আলোচনাকালে বলেন,—"আরবী উচ্চারণ ধরিয়া আরবী নাম লেখা যায়, কিন্তু সে উচ্চারণ সাধারণতঃ এ দেশে কেহ বুঝিবে না—তথাপি **আরবীর উচ্চারণ অনুসারে আরবী বর্ণকে বাঙ্গালায় প্রতিবর্ণীকরণের সহজ পদ্ধতি** নির্দিষ্ট হইল।

আরবী ও ফারসীর হ্রস্ব ই ও দীর্ঘ ঈ এবং হ্রস্ব উ ও দীর্ঘ ঊ বিষয়ে **কিঞ্চিৎ অবহিত হইতে পারা যায়,** এবং মূলানুসারে বাঙ্গালায় "ই, ঈ, উ, ঊ" **ব্যবহার করিলে মন্দ হয় না**—বিশেষতঃ ইতিহাসাদিতে আরবী ও ফারসী ভাষা হইতে গৃহীত মুসলমান নাম লিখনের বেলায়। আরবী ও ফারসীতে j ও z দুইটি ধ্বনি আছে; বাঙ্গালায় z-এর জন্য বিশেষ অক্ষর নাই, **জ- দ্বারা j ও z দুইয়েরই ধ্বনি প্রকাশিত হয়।** আবার পূর্ব -বঙ্গে জ-এর উচ্চারণ প্রায় সর্বত্র dz বা z। **এই জন্য বিশেষ অসুবিধা হয়**—Siraj= সিরাজ, Razzk =রজ্জাক, jahaz = জাহাজ (পশ্চিম-বঙ্গে jahaj ও পূর্ব-বঙ্গে zahaz রূপে উচ্চারিত), mijaz=মেজাজ (পশ্চিম-বঙ্গে [mejaj], পূর্ব-বঙ্গে [mezaz]), Jabbar=জব্বার, zabr= জবর" ইত্যাদি। এই জন্য কেহ-কেহ প্রস্তাব করেন, আরবী-ফারসী নামে j-এর ধ্বনি থাকিলে বাঙ্গালায় বর্গীয় "জ" লেখা, এবং z-এর ধ্বনি থাকিলে অন্তস্থ "য" লেখা; j =জ," "z = য"—এই ভাবে **বিনা ঝঞ্ঝাটে দুইটির পার্থক্য নির্দেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে কিছু কিছু অসুবিধাও আছে।**

আরবী-ফারসীতে s (= ص س ث) এবং sh (= ش), এই দুই'টী শিশ্ধ্বনি আছে। ش =sh-এর জন্য "শ" ব্যবহার করা উচিত—সর্বত্র; এবং **s-এর ধ্বনির জন্য, সংস্কৃতের ও ভারতের অন্যান্য ভাষার প্রয়োগের অনুরূপ "দন্ত্য স"-এর ব্যবহার-ই কর্তব্য,** যেমন—"Shah=শাহ, Sharif = শরীফ, Musharraf = মুশর্‌রফ, Murshid = মুর্শিদ, Danishmand= দানিশ্‌মন্দ; Sanaullah = সনাউল্লাহ, Osman = ওসমান, Sultan = সুলতান, Sufi = সুফী, Asghar = অস্‌ঘর, Nasiruddin = নাসিরুদ্দীন" ইত্যাদি। "স=s", "শ=sh—**ইহা সহজ-বোধ্য,** এবং **সাধু ও চলিত বাঙ্গালার ও সমগ্র ভারতবর্ষের অনুমোদিত রীতি।** পূর্ব-বঙ্গের বহু মুসলমান লেখক, পূর্ব-বঙ্গে প্রচলিত "ছ"-এর s—এই **প্রাদেশিক উচ্চারণ** অনুসরণ করিয়া, আরবী-ফারসীর s অর্থাৎ ص س ث স্থানে **বাঙ্গালায় "ছ" ব্যবহার করিয়া থাকেন**—"ছানাউল্লা, ওছমান, নাছিরুদ্দীন, ছোলতান, খাদেমুল্ এনছান্" ইত্যাদি। **বাঙ্গালা ভাষার ধ্বনি-তত্ত্বের দিকে এবং বাঙ্গালা বর্ণমালার ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, এই প্রকারে "ছ"-এর প্রয়োগ**

নিতান্ত আপত্তিজনক। পুরাতন বাঙ্গালায় যত আরবী-ফারসী নাম ও শব্দ প্রবেশ - লাভ করিয়াছে, সর্বত্রই s-এর ধ্বনি বাঙ্গালায় দন্ত্য-"স" রূপে লিখিত হইয়াছে; প্রাচীন সাহিত্যে ইহার ভূরি-ভূরি উদাহরণ আছে; "গিয়াসদ্দীন, নসরত, শাহ, হুসেন, সিরাজ, সোলেমান" প্রভৃতি বানানে তাহা স্পষ্ট—"গয়াছদ্দীন, নছরত, হুছেন, ছিরাজ, ছুলেমান" **আমরা পাই না। বাঙ্গালায় সর্বজন প্রচলিত ফারসী-আরবী শব্দেও "স" পাই,** "ছ" প্রায় নাই-ই; যথা "সনদ, সন; সাল, সরাই, সেপাই, সাবেক, সুরখি, সাজা, সালিস, সান ('সানের মেঝে'), সরহদ্দ, মফঃস্বল, সানকী, সবুর, সহি, খানসামা, তমঃসুক, মুসলমান, রসদ, আসমান, খাসী" ইত্যাদি। **"ছ" লেখায়, পশ্চিম-বঙ্গে "মুসলমান"-এর পার্শ্বে "মোছলমান" বানান হইতে কথ্য-ভাষায় "মোচোরমান" (mochorman) শব্দ** সৃষ্ট হইয়াছে; "কিস্‌সা =kessa, qissa" শব্দ "কেচ্ছা" (kechchha) হইয়াছে, "মরসিয়া"= marsiya শব্দের "মর্‌ছিয়া "বানানে "মর্চে" [morche] রূপ দাঁড়াইয়াছে, "মিসিল"= misil শব্দ "মিছিল" [michhil] হইয়াছে, "ওয়াসিলা" [wasila] শব্দ "অছিলা" [achhila], "পসন্দ"=pasand শব্দ "পছন্দ"[pachhanda] হইয়াছে, "অকসর" =akthar>aksar দাঁড়াইয়াছে "আকছার" [akchhar] রূপে, "তসর্‌রুফ"= tasarruf হইয়া দাঁড়াইয়াছে "তছরুপ" [tochhrup] ; এবং " ছোলতান, এন্‌ছান, মর্ছিয়া, ছালাম, ছাহেব, ছাদাত" **প্রভৃতি শব্দের "ছ"-দিয়া বানান, চলিত-ভাষা-ব্যবহারকারী অনভিজ্ঞ পশ্চিম-বঙ্গের হিন্দু ও মুসলমানদের মুখে** Chholtan, Enchhan, Marchhiya, Chhalam, Chhaheb, Chhadat রূপে ধ্বনিত হয়,— s উচ্চারণ শুনাই যায় না।

সুতরাং বাঙ্গালা ভাষার ও বর্ণমালার প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, এ ক্ষেত্রে "ছ" না লিখিয়া, "স" লেখাই সমীচীন। এতদ্ভিন্ন, মূল আরবীতে (ص, س, ث) তিনটীরই উচ্চারণ পৃথক্ পৃথক্; ث-এর আরবী উচ্চারণ হইতেছে দন্ত্য-স-ঘেঁসা উষ্ম "থ" — ইংরেজী think, thing-এর th-এর মত, এবং কতকটা "স্ব" বা sw-এর মত; কেবল س হইতেছে খাঁটী "দন্ত-স"। (ص, ظ, ز, ذ) এগুলির উচ্চারণ, ফারসী ও উর্দুতে একমাত্র "z" হইলেও, আরবীতে এক নহে; আরবীতে ز-এর উচ্চারণ হইতেছে z আরগুলির উচ্চারণ সম্পূর্ণ-রূপে পৃথক, ذ =ধ ض = "দ্ব" ও ظ "ধ্ব" জাতীয়। বিশুদ্ধ আরবী উচ্চারণ **যখন বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা সম্ভব হইবে না, তখন "ছ"-এর ব্যবহার-দ্বারা বিদেশী নাম chh ও s-এর গোলমাল সৃষ্টি করার কোনও সার্থকতা নাই।"**[১]

---

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (রূপ, সং. কলি-১৯৮৯), পৃষ্ঠা-৬৭-৬৮। এই কোটেশনের বোল্ড-চিহ্নিত অংশ বর্তমান লেখককৃত।

উপরের কোটেশন থেকে জানা যায়, ড. সুনীতিকুমারের মতে—'আরবী শব্দের উচ্চারণ ধ'রে আরবী নাম লেখা গেলেও, সে-উচ্চারণ বাঙালার কেউ বুঝবে না। তবু আরবী উচ্চারণ অনুসারে, আরবী বর্ণকে বাঙ্গালায় প্রতিবর্ণীকরণের সহজ-পদ্ধতি, তিনি নির্দশ ক'রে দিয়েছেন। কেবল তাই নয়, তিনি "ফারসীর ধ্বনিও বাঙ্গালায় লিখিবার রীতি" বাৎলে দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর এই বি'দাৎ বা প্রতিবর্ণীকরণের 'নববিধানে'র জরুরৎ কোথায়—সে-বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন ও আলোচনা করা আবশ্যক।

ড. সুনীতিকুমার আরবী-ফারছী শব্দের মূল উচ্চারণ বাঙালায় লেখা ও বাঙালীর মুখে উচ্চারণ করা সম্ভব নয় ব'লে যে-কারণ দেখিয়েছেন, তা হিন্দুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হ'লেও হ'তে পারে; মুছলমানদের তরফে প্রযোজ্য নয়। তাই এ-ধারণা অমূলক নয় যে, তিনি এখানে 'বাঙালী' শব্দে মুছলমানদের না বুঝিয়ে, সমকালীন ধারণা অনুযায়ী অমুছলমানদের-ই বুঝিয়েছেন।

যদি তা-ই হয়, তবে ঐ রকম কারণ কেবল আরবী-ফারছী শব্দের বেলায় নয়; সংস্কৃত ও অপরাপর ভাষা থেকে বাঙালা ভাষায় আগত শব্দ সম্পর্কেও দেখানো যায়। বিশেষ ক'রে, গত দুশ' বছর যাবৎ যে-সংস্কৃত বাঙালা, মুছলিম-অমুছলিম নির্বিশেষে সকল বাঙালীর অভিজাত ভাষায় পরিণত হ'য়েছে এবং যার লিখিত নমুনায় শতকরা নব্বই-পঁচানব্বইটা সংস্কৃত শব্দ বিদ্যমান; সে গুলোর শুদ্ধ উচ্চারণও যে, সংস্কৃত নিয়মে লিখলে খোদ্ সংস্কৃতের সন্তানরাই মুখে আনতে পারেন না; সে-কথা তো স্যার জর্জ গ্রীয়ার্সন-ই ব'লে গিয়েছেন। এমন কথা ব'লেছেন—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী; দীনেশচন্দ্র সেনও। তাহ'লে, ঐ সব শব্দ, সংস্কৃত থেকে বাঙ্গালায় আমদানীর জন্য—প্রতিবর্ণীকরণের সহজ-পদ্ধতি রচিত হ'ল না কেন? সেটা আশ্চর্য না ব'লে উপায় নেই। কেননা, আরবী-ফারছীর মত সংস্কৃতেরও অনেক বর্ণ এবং শব্দের মূল উচ্চারণও বাঙালীর জবানে আসে না। তা এ-দেশ, ও-দেশ যে-দেশের ই বাঙালী হোন না কেন।

কেউ কেউ হয়তো ব'লতে পারেন; ঐ সব শব্দ বহুকাল বাঙালা ভাষায় চালু আছে ব'লে, ওগুলোর আর প্রতিবর্ণীকরণের প্রয়োজন নেই। কথাটা সত্য নয়। কারণ সারা বাঙালায় কেবল শিক্ষিত জনসমাজে সংস্কৃত- বাঙালার প্রচলন ঘ'টেছে এক শ' বছর মাত্র। তাঁর আগে শত শত বছর "গোটা অবিভক্ত বাঙালার বাঙালী" (মুছলিম-অমুছলিম) জনসমাজে চালু ছিল ফারছী-বাঙালা। সংস্কৃতের মত দীর্ঘ কাল কোন ভাষা চালু থাকলে, যদি প্রতি-বর্ণায়নের প্রয়োজন না হয়, তাহ'লে আরবী, ফারছী ও উরদু শব্দের ক্ষেত্রেই বা তার দরকার হবে কেন? কাজেই

অবিভক্ত বাঙালার পূর্ব-পশ্চিম নির্বিশেষে সকল এলাকাতেই শতকরা নব্বইটি আরবী, ফারছী, উরদু শব্দ শত শত বছর চালু ছিল ব'লে, ঐ সব শব্দের মূল রূপটি বাঙালীর বাঙালা ভাষায় কি রকম দাঁড়ানো উচিত, তা নিশ্চয়-ই পাঁচ-সাত শ' বছরে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে গিয়েছিল। তখন ঐ প্রতিবর্ণীকরণ-পদ্ধতি যে, আরবী-ফারছী-উরদু শব্দের বাঙালা উচ্চারণ ও বানানে প্রয়োজনীয় ব'লে বিবেচিত হয়নি কেন, সে কথাটাও একবার ভেবে দেখা দরকার। তাই একথা বলা অমূলক নয় যে, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ঐ বি'দাৎ বা 'নয়া আইন' (তথাকথিত 'প্রতিবর্ণীকরণের সহজ পদ্ধতি') বাঙালীর মূল বাঙালা ভাষাকে উচ্চারণ ও বানান-লেখনে প্রায় হাজার বছরের ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দিয়েছে। তা কবুল না ক'রে উপায় নেই। ড. সুনীতিকুমারের ঐ কথার মধ্যে স্ব-বিরোধিতাও সহজেই নজর করা যায়। তিনি যে-উচ্চারণ অনুসারে লিখলে, আরবী নাম এদেশের কেউ বুঝবে না ব'লেছেন; সেই "উচ্চারণ অনুসারে"ই আরবী হরফকে বাঙালায় "'প্রতিবর্ণীকরণ" ক'রেছেন। এই স্ব-বিরোধী কথা ও কাজের কারণে তো বটেই, সেই সাথে সামাজিক-ঐতিহাসিক কারণেও এবিষয়ে অপর একটি প্রশ্ন না উঠে পারে না। তা হ'ল—বাঙালায় আরবী-ফারছী নাম-শব্দের প্রচলন কেবল সুনীতি বাবুর সময় থেকেই শুরু হয়নি; তাঁর জন্মেরও বহু পূর্বেই এদেশে কয়েক শ' বছর ধ'রে আরবী-ফারছী নাম-শব্দের ব্যাপক প্রচলন ছিল। শত শত, হাজার হাজার আরবী-ফারছী নাম।

সে সব নাম আরবী-ফারছী ভাষার উচ্চারণ-রীতি বা ধ্বনি অনুসারেই হ'য়ে এসেছে। ট্রান্সলিটারেশন (Transliteration) বা প্রতিবর্ণায়নের কোন দরকার হয়নি। ড. চট্টোপাধ্যায় কি তা জানতেন না? তাহ'লে শতকরা ষাট ভাগ আরবী নামধারী মুছলমানের বাঙালা দেশে, চলমান ঐতিহ্য অনুসারে আরবী নাম লেখার পরামর্শ তিনি কেন দেননি, তা বোঝা কঠিন।

প্রতিবর্ণীকরণ আদৌ সম্ভব কি?

যাহোক, উক্ত দু'টো প্রশ্নের সূত্রে বেশ জোরের সাথেই বলা যায়, কোন কালেই এক ভাষার বর্ণমালাকে অন্য ভাষার বর্ণমালায় এক শ' পার্সেন্ট প্রতিবর্ণায়ন করা যায় না। যেমন সংস্কৃত 'ঠাকুর' শব্দটির তিনটি বর্ণ

ও দু'টি স্বরচিহ্ন—ইংরেজীতে প্রতিবর্ণায়ন ক'রতে গেলে লিখতে হয় 'Takur' রূপ পাঁচটি ইংরেজী হরফ। এ-শব্দে দু'টি ভাউয়েল (Vowel) আছে; কোন স্বরচিহ্ন নেই; আর আছে তিনটি ব্যঞ্জন-বর্ণ বা Consonant. তবু শব্দটি একশ' পার্সেন্ট

অভিন্ন হয়নি। একশ' পার্সেন্ট প্রতিবর্ণিত হয়নি। 'ঠাকুর' তৈরী না হ'য়ে—তৈরী হ'য়েছে 'টাকুর'। তাতে ইংরেজী ভাষার ইজ্জৎ বাড়েনি ব'লে, ইংরেজীতে শব্দটিকে ট্যাগোর বা টাগোর Tagor করা হ'য়েছে। অথচ ঠ-এর সাথে ট বা T-এর কোন সম্পর্ক নেই। এক-ই ভাবে আরবী-ফারছী ভাষারও সকল হরফ-ই বাঙালা লিপিতে বদল করা যায় না। যেমন আরবী আলিফ হরফের বাঙালা প্রতিবর্ণ 'আ' না 'অ'? এক-ই ভাবে আরবী আইন (ع) হরফের কি কোন বাঙালা প্রতিবর্ণ পাওয়া যায়? আরবী ওয়াও-(و) এর প্রতিবর্ণ 'ও' না, 'উ' ? আরবীতে দু'টি ' হে' বা 'হা' (ح,ه) আছে। বাঙালায় ওরকম দুটো 'হ' আছে কি? অপর দিকে, "আধুনিক" বাঙালায় চালু খ,ঘ, ঙ, ঞ, ভ, অনুস্বার (ং), বিসর্গ (ঃ), চন্দ্রবিন্দু (ঁ) প্রভৃতির কোন আরবী প্রতিবর্ণ দেখানো যায় না।

বলা দরকার, কেবল সংস্কৃত-ইংরেজী, ইংরেজী-সংস্কৃত, আরবী-বাঙালা ও বাঙালা-আরবী অথবা সংস্কৃত- বাঙালা ও বাঙালা-সংস্কৃত লিপিমালার মধ্যে নয়; দুনিয়ার প্রত্যেকটি ভাষার লিপি-ই আপন বৈশিষ্ট্যে আলাদা আলাদা । ঐ সব লিপির কোন দু'টি-ই সমবাহু ত্রিভুজ বা তেকাঠিয়ার মত একটি অপরাটির উপর প্রতিস্থাপিত হয় না। প্রতি-বর্ণায়িতও হয় না। কাজেই **যে-কোন অর্থেই প্রতিবর্ণায়ন একটি ভুল ভাষাতাত্ত্বিক পদক্ষেপ।**

প্রতিবর্ণনায়নের মত কোন দু'টি ভাষার শব্দগত একশ' পার্সেন্ট ধ্বনি-সাম্যও সর্ব ক্ষেত্রেই খুঁজে পাওয়া যায় না। একারণে আরবী শব্দের উচ্চারণ-ধ্বনি যেমন বাঙালায় সর্বত্র হুবহু এক-ই ধ্বনি-তরঙ্গ তুলতে পারেনা; তেমনি সংস্কৃত শব্দেরও প্রকৃত উচ্চারণ-ধ্বনি বাঙালায় আসে না; বাঙালীর জিহ্বায় জাগে না। টুলো ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের পক্ষেও সংস্কৃত শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ-ধ্বনি বাঙালায় আনা ও মুখে বলা সম্ভব নয়। যেমন বাঙালায় 'সূর্য্য সঙ্কাশ', 'কাশ্যপ', 'শ্যাম' প্রভৃতি লেখা হয় এক রকম, উচ্চারিত হয় অন্য রকম। খোদ্ ব্রাহ্মণদের মুখেই ঐ সব শব্দের উচ্চারণ-বিপর্যয় ঘটে।

এক-ই ভাবে উড়িয়ারা 'ল' ধ্বনি, ইটালীয়ানরা 'ট' বা ইংরেজী টি (T) ধ্বনি এবং আরবীয়রা 'প' ধ্বনি উচ্চারণ ক'রতে পারে না। তাহ'লে আরবী ও ফারছী ভাষার সমস্ত ধ্বনি-ই বা পুরোপুরি অনুসরণ ক'রে প্রতিবর্ণনায়ন সম্ভব কি ভাবে? ফলে, একথা কবুল না ক'রে উপায় নেই যে, উচ্চারণের দিক থেকেও এক ভাষার শব্দ, ভিন্ন দেশের অন্য ভাষী জনগোষ্ঠীর পক্ষে কখনও সর্বক্ষেত্রে হুবহু এক রকম উচ্চারণ করা সম্ভব নয়।

এসব কথা শ্রদ্ধেয় ভাষাতত্ত্ববিদ্ ও বৈয়াকরণ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নিশ্চয়-ই অজানা ছিল না। তবু কেন তিনি আরবী-ফারছী শব্দের প্রতিবর্ণায়নের পথে পা বাড়ান, তা বোঝা কঠিন।

ড. চট্টোপাধ্যায়, তাঁর ঐ ব্যাকরণে বাঙালা ভাষায় মুছলমানদের নাম লেখার 'বে-শরা' বিধি-বিধান যে, অতিশয় হেলা-ফেলার সাথে রচনা ক'রেছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি বাঙালায় মুছলিম নাম লেখার ক্ষেত্রে কি করা উচিত সে-বিষয়ে অতি সাধারণ আলোচনা ক'রেছেন; পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেন নি। ড. চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—"আরবী ও ফারসীর হ্রস্ব-ই ও দীর্ঘ-ঈ এবং হ্রস্ব-উ ও দীর্ঘ-ঊ বিষয়ে কিঞ্চিৎ অবহিত হইতে পারা যায় এবং মূলানুসারে বাঙ্গালায় ই, ঈ, উ, ঊ ব্যবহার করিলে মন্দ হয় না।"

ড. চট্টোপাধ্যায় চারটি বাঙালা হরফের বিপরীতে আরবী-ফারছীতে যে-চারটি ধ্বনি বা হরফ আছে; সেই চারটি ধ্বনি কোন্ কোন্‌টি তা উল্লেখ করেন নি। কেন সে-গুলোর নাম লেখেননি—তার ব্যাখ্যা কি? তা কে ব'লবে ?

একথা তো তিনিও জানতেন যে, আরবী-ফারছী ভাষায় হ্রস্ব-ই জ্ঞাপক ধ্বনির কোন নির্দিষ্ট বর্ণ-চিহ্ন নেই। সাধারণ ভাবে আরবী 'জের' চিহ্ন -(ـِ) কে 'ই' এবং 'ইয়া'-(বড় ইয়া-ی) কে দীর্ঘ-'ঈ' বর্ণতুল্য মনে ক'রলেও করা যেতে পারে। কিন্তু 'জের-এর -Variation আছে দু'টি। তার একটি হ'ল—সাধারণ ' 'জের', অন্যটি—খাড়া-'জের' । খাড়া 'জের'—স্বরের দীর্ঘত্ব সূচক। আবার 'ইয়া'ও আছে দু'টি। 'ছোট ইয়া' বা 'ইয়ে' (ی) এবং বড় 'ইয়া' (ی)। এ দুটি বর্ণের মধ্যেও স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ আছে। বড় ইয়াকে যদিও দীর্ঘ-ঈ জ্ঞাপক ব'লে মনে করা হয়, তথাপি এই হরফটি মূল আরবীতে এবং বাঙালায় শত শত বছর ধ'রে হ্রস্ব-ইর-ই ঘানি টেনে এসেছে। তা আরবী ও বাঙালা বর্ণ-মালার নিম্নোক্ত সমীকরণ থেকে বোঝা যায়।

সারণি -১

ا = আ ب = ব ت ط = ত ث س ص = ছ ج ز ظ = জ ح ه = হ خ = খ د ض = দ ر = র ش = স ع = X	غ = গ ف = ফ ق ك = ক ل = ল م = ম ن = ন و = উ لا = X ء = X ى = ই		মন্তব্যঃ এ- সারণিতে স্পষ্ট রূপেই আরবী আঠাশটি হরফের বাঙালা উচ্চারণ-ভিত্তিক প্রতিরূপে আঠারোটি হরফ পাওয়া যায়। এর মধ্যে স্বরবর্ণ তিনটি এবং ব্যঞ্জন বর্ণ পনেরটি মাত্র।

সারণি-২ (স্বরবর্ণ)

অ =	X	ঋ, ঋ =	X	মন্তব্যঃ-
আ = ا	(আলিফ)	ঌ, =	X	অনুস্বারও বিসর্গকে
ই = ى	(ইয়া)	এ =	X	ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে
ঈ =	X	ঐ =	X	দেখানো হ'য়েছে।
উ = و	(ওয়াও)	ও =	X	
ঊ =	X	ঔ =	X	

সারণি-৩ (ব্যঞ্জনবর্ণ)

ক = ق ك	(ক্বফ) (কাফ্)	ধ=	X	মন্তব্যঃ
খ = خ	(খে)	ন= ن	(নুন)	এ-তালিকায়
গ = ع	(গায়েন)	প=	X	ড়,ঢ়,য়,ৎ,ং ঃ এবং
ঘ,ঙ,চ, =	X	ফ= ف	(ফে)	চন্দ্রবিন্দুকে বাদ
ছ = ث س ص	(ছে,ছিন, ছোয়াদ)	ব= ب	(বে)	দেয়া হ'য়েছে।
জ = ج ز ظ	(জিম) (জে)	ভ=	X	কারণ এ গুলো
ঝ,ঞ, ট, ঠ, ড,ঢ,ণ =	X	ম= م	(মিম)	বাঙালা বর্ণ-মালায়
ত = ت ط	(তে)	য=	X	আধুনিক
থ =	(তোয়)	র=	(রে)	সংযোজন।
দ = د ض	X (দাল) (দোয়াদ)	ল= ل	(লাম)	গুরুত্বহীনও বটে।
		ব=	X	
		শ, ষ= ش	X	
		স=	(শিন)	
		হ= ح ه	(বড় হে) (ছোট হে)	

আরবী হরফ ভিত্তিক বাঙালা ও বাঙালা হরফ ভিত্তিক আরবীলিপির সমন্বয়মূলক প্রতি-বর্ণায়নের উক্ত সারণি দু'টি থেকে দেখা যায়, মাত্র পনেরটি ব্যঞ্জনবর্ণ ও তিনটি স্বরবর্ণ মিলে আঠারোটি হরফে এই সমীকরণ সম্ভব। অন্য গুলোতে নয়। তা থেকে দেখা যায়, উচ্চারণের ভিত্তিতে আরবী হরফ বাঙালায় প্রতিবর্ণীকরণ প্রায় অসম্ভব ব'ললেই চলে। আরবী আটাশ বা একত্রিশটি হরফ, তথাকথিত বাঙালা পঞ্চাশটি বর্ণের প্রায় অর্ধেক হওয়ায় উভয়ের মধ্যে মাত্র আঠারোটি বর্ণের সাযুজ্য দেখানো যায়।

এছাড়া, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আরবী ও ফারছীতে হস্ব-ই, দীর্ঘ-ঈ এবং হ্রস্ব-উ, দীর্ঘ-ঊ অক্ষরের প্রতি-বর্ণায়নে কোন্ কোন্ আরবী বর্ণ; মূল ধ'রে ব্যবহার ক'রতে চেয়েছেন; তা নির্দিষ্ট ভাবে না লেখায়, সচেতন পাঠক মাত্রেই বিভ্রান্ত হ'তে বাধ্য। কারণ উপরে তুলে ধরা স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের সমীকৃত সারণি দু'টিতে দেখানো হ'য়েছে যে, আরবীতে দীর্ঘ-'ঈ', দীর্ঘ- ঊ জ্ঞাপক কোন হরফ নেই। ছোট 'ইয়ে' হ্রস্ব-ই নয়। আর বড় 'ইয়া'কেও হ্রস্ব-ই রূপেই গণ্য করা হয়। যেমন ফজলে রাব্বির "রাব্বি" (رَبِّيْ)।

আর 'ওয়াও'-এর মাথায় জবর থাকলে, তা ' উচ্চারিত হয় 'ওয়া' রূপে; পেশ থাকলে হয় 'উ' রূপে। যেমন–"উলায়েকা" (أُولَئِكَ)।

সমস্যার এখানেই শেষ নয়। আরবী-ফারছী ও উরদুতে জের, জবর, পেশ—ই-কার/=এ-কার, আকার, ও-কার/উ-কার নির্দেশের ক্ষেত্রে যতটা নির্দিষ্ট, ইয়া/ইয়ে, আলিফ, ওয়াও ততটা নয়। তার ওপর খাড়া জবর, খাড়া জের, দুই পেশ. ছোট মদ, বড় মদ, তাশ্‌দীদ ওগয়রহ তো আছেই। এগুলোও স্বরের বা উচ্চারণের হ্রস্ব-দীর্ঘত্বের ক্ষেত্রে , বর্ণ-সংযোজনে ও হ্রস্ব-দীর্ঘ নাসিক্য উচ্চারণে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে। কাজেই আরবী হরফের প্রতিবর্ণায়ন আথবা বাক্যে আরবী শব্দের সঠিক উচ্চারণে বাঙালা হরফ বসানো প্রায় অসম্ভব। **তাই প্রয়োজন—প্রতিবর্ণায়ন নয়; প্রতিরূপ আওয়াজ উৎপাদন। অনুরূপ ধ্বনি–উৎপাদন।**

অবশ্য একথা আরবী-ফারছী ও বাঙালা ভাষায় সাধারণ জ্ঞান রাখা লোকেও জানেন, আরবীতে স্বরবর্ণ তিনটি। আলিফ, ওয়াও এবং ইয়া। স্বরচিহ্নও তিনটি। জের, জবর ও পেশ। কিন্তু ঐ তিনটি স্বর-চিহ্নের নানা রকম variation এবং স্বরের দীর্ঘ, দীর্ঘতর ও দীর্ঘতম রূপ বোঝানো আরও কয়েকটি ধ্বনি-চিহ্নের ব্যবহার আরবী-ফারছী ভাষাকে জটিল-কঠিন ক'রে তুলেছে। অপর দিকে বাঙালায় এগারোটি স্বরবর্ণ (দুটা 'লি' এবং দুটা দীর্ঘ -ঋ বাদে) ও এগারোটি স্বর-চিহ্ন সহ

অনুস্বার, বিসর্গ ও চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার আধুনিক বাঙালাকে ক'রেছে আরও জটিল এবং কঠিন।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এসব বিষয়ে পুরোপুরি আলোচনা না ক'রে, কেন "কিঞ্চিৎ জানা যায়", "লিখলে মন্দ হয় না" ব'লে ছেড়ে দিলেন, তা বলা কঠিন।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাঙালায় মুছলিম নাম লেখার ক্ষেত্রে একমাত্র ইতিহাসে বর্ণিত নামগুলোর প্রতি নজর দিয়ে সমকালীন সমাজের প্রায় ষাট ভাগ মুছলিম জনসাধারণকে উপেক্ষা ক'রেছেন। এর কারণ কি—তাও রহস্যজনক বৈকি। তাছাড়া, গোটা বাঙালাসহ সারা উপমহাদেশেই সমকালীন মুছলিম নাম লেখনে; আরবী নিয়মে হরফে 'সামছী' ও হরফে 'কামারীর' যে-ভূমিকা র'য়েছে এবং ছিল, সে-বিষয়ে কেন তিনি একেবারেই কোন আলোচনা তুললেন না; তাও বোঝা দুষ্কর।

বলা দরকার যে, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের আলোচনার সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা কেবল মুছলিম নাম-শব্দের চৌহদ্দিতে সীমিত থাকেনি। কেবল আরবী, ফারছী ও বাঙালার স্বরবর্ণ-স্বরচিহ্ন ব্যবহারের বেলায়ও নয়। তাঁর প্রিয় প্রতিবর্ণায়নের সহজ পদ্ধতি, বাঙালা ভাষায় ব্যবহৃত অন্যান্য আরবী-ফারছী ও উরদু শব্দের ক্ষেত্রেও বিস্তৃত হ'য়ে প'ড়েছে। ড. চট্টোপাধ্যায় আলোচনার এ অংশে আরবী-ফারছী 'ব্যঞ্জন' বর্ণের সাথে বাঙালা ব্যঞ্জন বর্ণের সম্পর্কেরও পুরো আলোচনা না ক'রে লিখেছেন —'আরবী ও ফারসীর জে (J) ও জেড (z) দু'টো ধ্বনি আছে। বাঙালায় জেড্ (z)-এর অনুরূপ কোন অক্ষর নেই। তাই বাঙালায় 'জে' ও 'জেড্' ধ্বনির জন্য বর্গীয় 'জ' ব্যবহার করা হয়।'

সচেতন পাঠক এখানে এসেও অবাক না হ'য়ে পারেন না। কারণ আরবী-ফারছী ও বাঙালায় সুবিদ্বান ড. চট্টোপাধয় আরবী-বাঙালার প্রতিবর্ণায়ন নিয়ে আলোচনা ক'রতে গিয়ে বার বার ইংরেজী অক্ষর ও ধ্বনির উল্লেখ কেন ক'রেছেন? আরবী-ফারছীর ঐ দু'টো ধ্বনি প্রকাশক হরফ যখন আছে, তখন সে দু'টো হরফের নির্দিষ্ট উল্লেখ কেন করেননি—সে-প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

যাহোক, বিজ্ঞ ভাষাতত্ত্ববিদ্-এর ঐ বক্তব্যের পরবর্তী অংশ প'ড়লে জানা যায়, তিনি তাঁর আরবী-ফারছী ধ্বনির ইংরেজী অক্ষরান্তরণকে বাঙালার ঘাড়ে চাপিয়ে ব্যাখ্যা ক'রতে গিয়ে **"পূর্ব-বঙ্গ" ও পশ্চিম-বঙ্গ" এলাকা ভেদের প্রশ্নও** তুলেছেন এবং ব'লেছেন 'পূর্ব-বঙ্গে বর্গীয় জ-এর উচ্চারণ প্রায় সর্বত্রই dz বা z (?)। কিন্তু "পশ্চিম-বঙ্গে" তা 'জ' (j) ই। তাই তাঁর মতে "পূর্ব-বঙ্গে" যে-সব শব্দে z-এর

ধ্বনি আছে, সে-সব শব্দে 'জ' লিখলে "বিশেষ অসুবিধা হয়"। কারণ জ দ্বারা j ও z দুয়েরই ধ্বনি প্রকাশিত হয়।" সেজন্য তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী এক-ই শব্দ "জাহাজ"—এ-দেশে লিখতে হবে 'জাহাজ'; কিন্তু ও-দেশে 'জাহায'। এক-ই ভাবে এদেশে লিখতে হবে 'মেজাজ', ও-দেশে 'মেজায'; এ-দেশে 'সিরাজ,' ওদেশে 'সিরায্'। কারণ এভাবে লিখলে নাকি "বিনা ঝঞ্ঝাটে দুইটির (j ও z) পার্থক্য নির্দেশ করা যাইতে পারে"।

এবার দেখা দরকার ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথা কতটা সত্য। তাঁর এ-প্রস্তাব মাফিক লেখার প্রথম অসুবিধা হ'ল—আরবী বর্ণমালার কোন্ কোন্ ধ্বনি বা অক্ষরকে বোঝাবার জন্য j ও z-এর কথা বলা হ'য়েছে, তা কারো বোধগম্য হবার কথা নয়। কারণ আরবী-ফারছী বর্ণমালায় 'জিম,' 'জাল,' 'জে', 'জোই' র'য়েছে, যার প্রত্যেকটির জন্য 'জ' ব্যবহৃত হ'তে পারে বা হ'য়ে এসেছে। এছাড়া 'দাল' ও 'দোয়াদ' হরফ দু'টিও অনেক ক্ষেত্রে 'জ'-এর দ্বারা প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ ঐ দু'টির 'প্রতিবর্ণীকরণে 'দ' এলেও আসলে বহু শব্দে তা 'জ'-ধ্বনি দ্বারা প্রকাশ করাই এদেশের চিরাচরিত বাঙালা রীতি। যেমন 'অজু'; 'রমজান' ইত্যাদি। এসব ব্যাপার পুরোপুরি বিচার-বিচেনা না ক'রে, শুধু 'জ' এবং 'য' দিয়ে "পূর্ব-বঙ্গ"-"পশ্চিম-বঙ্গ" বানানভেদ-নির্দেশ একটি আন্তরিকতাহীন এবং বেঠিক আলোচনা, তা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। কাজেই এবার আমাদের দেখা দরকার, ঐ সব ক্ষেত্রে অবিভক্ত বাঙালার— বাঙালীর মূল বাঙালা ভাষা-(ফারছী-বাঙালা)র পাঁচ-সাত শ' বছরের যে-অনুশীলন—তার চেহারা-ছবি কি রকম। তথাকথিত "পূর্ব-বঙ্গ" ও "পশ্চিম-বঙ্গে" মুদ্রিত মুছলিম সাহিত্যে 'জ' ও 'য'-এর এরকম কোন ভেদ আছে কি না। সে জন্য কোলকাতায় মুদ্রিত—'কেচ্ছা আলেফ লায়লা' থেকে উদ্ধৃত নিচের নমুনাগুলোর দিকে নজর দান করা যেতে পারে।

১. "ছয় মাস আট রোজ হয় হেছাবেতে॥"
আছিলেন জাহাজে আল্লার ফজলেতে ★"[২]

২. এত শুনি আজাজিল জড় দিয়া যায়॥"[৩]

---

২. ক) মুনশী ছৈয়দ নাছের আলী
খ) হবিবল হোসেন ও
গ) আয়েজদ্দীন আহ্মদ কর্তৃক রচিত 'কেচ্ছা আলেফ লায়লা', পৃষ্ঠা-৭৩।

৩. ঐ, পৃষ্ঠা-৭৪।

৩. "এলাহির নাম লিয়া জোবান উপরে।।
কাগজে কলম ধরি লিখিবার তরে *
তারিফ করিতে কেহু না রহিল আর।।
ছোলেমান আজিজ যাতে তাকত কাহার *
পাও হইতে চোলে যাও হজ করিবারে।।
হাত দিল খয়রাত জাকাত করিবারে *
যতেক আদম পয়দা হইল জাহানে।।
কামালিয়েত ফজুলিয়েত পায় জোনে জোনে*"[৪]

এবার ঢাকা থেকে মুদ্রিত ' জঙ্গে খয়বর "নামক আর একটি গ্রন্থের নজীর দেয়া যেতে পারে—

"নবীর আওলাদ আর যত আজওয়াজ।।
বিবিয়ান পাক দেলে আর পাক জাত*
আবদাল আওলাদ আর যতেক নাজিবা।।
ছালেক মজ্জব আর যতেক নাকিবা *
আর যত গাজিয়ান আর শহীদান।।
আর যত হাজিরান আর আবেদান *
মোজতাহেদ মোহাদ্দেছ আর সায়েমীন ।।
তার্‌পরে দীনদার যতেক মোমিন *
তার পরে মোছান্নেফ যত ছাহেবান।।
প্রকাশ করিল যারা আরবী জবান *
ফারসী জবানে রচে কতক শায়ের *
সকলের নাম আছে আলমে জাহের *"[৫]

উপরে লিখিত কোটেশনগুলোয় মুদ্রিত রোজ, জাহাজ, ফজল, আজাজিল, জোবান, কাগজ, আজিজ, হজ, জাকাত জাহান, ফজুলিয়ত; আজওয়াজ, নাজিবা, মজ্জব, গাজিয়ান, হাজিরান, মোজতাহেদ, জবান, জাহের শব্দগুলোর দিকে তাকালে তাকালে দেখা যায়—অবিভক্ত বাঙালার খাঁটি বাঙালা পুথি—কেতাবে বাঙালার উভয় এলাকার কবি-লেখকগণ-ই আরবী জাল (ذ), জিম (ج),

৪. ঐ, পৃষ্ঠা-১।

৫. দ্রষ্টব্য, জেহাদে হায়দর/ জঙ্গে খয়বর/পৃষ্ঠা ৩-৪)।

জে (ز), জোই বা জোয়া-(ظ), জদ বা জোয়াদ (ض) কে সর্বত্রই বর্গীয় 'জ' দিয়ে ভাষান্তর ক'রেছেন। **একে প্রতিবর্ণীকরণ না ব'লে আওয়াজের প্রতিরূপ উৎপাদন বা মূল ধ্বনির (শব্দগত) প্রতিরূপায়ণ বলা যায়।** ড. চট্টোপাধ্যায়ের লিখিত শব্দগুলোসহ পূর্বোক্ত দু'টি ছাপা কেতাব থেকে প্রাপ্ত, নিম্নোক্ত শব্দগুলোর বাঙালা ও আরবী-ফারছী বানান নজর ক'রলেও তার স্পষ্ট নজীর মিলবে।

	মূল বানানে আরবী-ফারছী শব্দ	বাঙালা বানানে লিখিত শব্দটি	শব্দমধ্যস্থ হরফান্তর
১.	رُوْج	রোজ	ج = জ
২.	جَهَاج	জাহাজ	ج = জ
৩.	فَضْلْ	ফজল	ض = জ
৪.	اَجَاجِيْلْ	আজাজিল	ج = জ
৫.	زَبَانْ	জবান	ز = জ
৬.	عَزِيْزْ	আজিজ	ز = জ
৭.	حَجّ	হজ	ج = জ
৮.	زَكٰوةْ	জাকাত	ز = জ
৯.	جَهَانْ	জাহান	ج = জ
১০.	فَضُوْلِيَّةْ	ফজুলিয়ত	ض = জ
১১.	اَزْوَاجْ	আজওয়াজ	ز، ج = জ
১২.	نَجِيْبَةْ	নাজিবা	ج = জ
১৩.	مُحَجَّبْ	মহজ্জব	ج = জ
১৪.	غَزْرَبَانْ	গাজিয়ান	ز = জ
১৫.	حَاضِرِيْنْ	হাজিরান	ض = জ
১৬.	مُجْتَهِدْ	মুজতাহিদ	ج = জ
১৭.	ظَاهِرْ	জাহের	ظ = জ
১৮.	مِزَاجْ	মেজাজ	ز ج = জ
১৯.	جَبَّا	জব্বার	ج = জ
২০.	جَبَرْ	জবর	ج = জ
২১.	ظَاهِرْ	জাহির	ظ = জ
২২.	جَعْفَرْ	জাফর	ج = জ
২৩.	ظُلْمَةْ	জুলমাত	ظ = জ
২৪.	ضَرُوْرْ	জরুর	ض = জ
২৫.	ضَامِنْ	জামিন	ض = জ

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'কোট্'-করা-শব্দগুলোসহ ঢাকা ও কোলকাতা থেকে যথাক্রমে ১৩৩৩ ও ১৩৩৫ সালে প্রকাশিত দু'খানি মুছলমান-রচিত শায়েরী কেতাবের পূর্বোক্ত কোটেশনে নিহিত সারণিবদ্ধ পঁচিশটি শব্দ থেকে দেখা যায়; উভয় বাঙালাতেই ض ظ ج ز ذ (জাল, জে, জিম, জোই ও জোয়াদ) হরফ যুক্ত বাঙালা শব্দে জ-ই ব্যবহৃত হ'য়েছে। কোথাও 'জ'; কোথাও 'য' নয়।

এরকম লেখার ফলে—"বিশেষ অসুবিধা" হওয়া তো দূরের কথা, কোন রকম অসুবিধাই কখনও হয়নি। ফলে, j=(ض ظ ج ز ذ-এর কোনটা?) স্থানে 'জ' এবং z = (ذ ظ ض) স্থানে 'য' লিখলে; "বিনা ঝঞ্ঝাট" তো নয়-ই; বরং বিশেষ "ঝঞ্ঝাট" সৃষ্টি করা হয়।

এবার ড. চট্টোপাধ্যায়ের সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ক্ষতিকর পরামর্শ বা আইনটির মুখোমুখী হ'তে হবে।

ড. চট্টোপাধ্যায় ব'লেছেন—আরবী ও ফারছী হরফমালায় ছে, ছিন ও ছোয়াদ "শিস্ধ্বনি"। আরবী 'শিন' (ش) এবং ইংরেজী এস্ (s) ও এস-এইচ (sh) শিস্ধ্বনি হ'লেও, 'ছে, ছিন ও ছোয়াদ' তা নয়। সে জন্য ঐ তিনটি হরফের "প্রতিবর্ণায়নে" দন্ত্য 'স'-এর ব্যবহার অকর্তব্য। তবে শিন-এর স্থলে এখন 'তালব্য-শ' ব্যবহার করা চলে। আগে দন্ত্য-'স'-ই ব্যবহার করা হ'ত।

এবার ড. চট্টোপাধ্যায়—এই অসংগত প্রস্তাবকে যুক্তি-সংগত রূপ দেবার জন্য যা ব'লেছেন, তা আলোচনা করা যেতে পারে।

বিজ্ঞ ভাষাতত্ত্ববিদ্ সর্বজনশ্রদ্ধেয় ড. চট্টোপাধ্যায় এ-সম্পর্কে যা ব'লেছেন,তার একটি হ'ল—**"সংস্কৃতের ও ভারতের অন্যান্য ভাষার প্রয়োগের অনুরূপ** (এ-সব ক্ষেত্রে) 'স'-এর ব্যবহার কর্তব্য। তাঁর এ-যুক্তি থেকে বুঝতে কষ্ট হয়না যে, তৎপ্রস্তাবিত এবং হাল সন পর্যন্ত অনুসৃত **প্রতিবর্ণীকরণের আসল ভিত্তি সংস্কৃত বানান-পদ্ধতি**। ভারতের অন্যান্য ভাষার প্রসঙ্গটি পরে আলোচনা করা যাবে। এখন এ-সম্পর্কে সুনীতিকুমারের অপর যুক্তির উল্লেখ করা আবশ্যক, তিনি 'ছে, ছিন, ছোয়াদ'-এর জন্য 'স'-নির্দেশের অপর যুক্তি দিতে ব'লেছেন—'স'=s (এস্) এবং 'শ'=sh (এস্-এইচ্) **'সহজবোধ্য, সাধু, চল্তি বাঙালার ও সমগ্র ভারতে অনুমোদিত-রীতি**।' লেখকের এ-যুক্তি থেকে প্রমাণিত হয়, তিনি বাঙালা ভাষা যখন 'সাধু' ও 'অসাধু' বা "চলিত" ভাষায় বিভক্ত হয়নি (বিভক্তির শুরু ১৮০১ খৃঃ থেকে); তার পূর্ববর্তী বাঙালা বানান-রীতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রেছেন। বাঙালায় প্রচলিত আরবী, ফারছী ও উরদু শব্দের বানান বদলিয়ে 'ভারতীয় করণ' তথা

'সংস্কৃতায়ন'-ই তাঁর 'প্রতবর্ণীকরণ'-পদ্ধতির মুলনীতি। তা-ই তাঁর উদ্দেশ্য। অতএব তা বিশেষ উদ্দেশ্য- প্রণোদিত, একদেশদর্শী ও আপত্তিকর।

ড. চট্টোপাধ্যায় এ-বিষয়ে অপর যে-যুক্তি দিয়েছেন, তা হ'ল—**"বাঙ্গালা ভাষায় ধ্বনিতত্ত্ব"** ও **"বাঙ্গালা বর্ণমালার ইতিহাসের দিক"** থেকে ঐ রূপান্তর গ্রহণযোগ্য; 'ছ'-এর প্রয়োগ নিতান্ত আপত্তিজনক। বুঝতে কষ্ট হয়না যে, ড. চট্টোপাধ্যায় বাঙালা ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব ব'লতে 'সংস্কৃতের-ধ্বনিতত্ত্ব'কে এবং এর Standard হিসেবে কোলকাতার 'পণ্ডিতী উচ্চারণ'কেই বুঝিয়েছেন। এ-ধ্বনিতত্ত্ব যে, বাঙালীর জিহ্বায় অর্থহীন , আড়ষ্ট ও অপাংক্তেয়,তা একাধিক পণ্ডিত স্বীকার ক'রেছেন। অতএব ঐ ধ্বনিতত্ত্ব—আরবী-ফারছী শব্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হ'তে পারে না।

বাঙালা লিপির ইতিহাস-এর দিক থেকে বিচার ক'রলেও ড. চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য গ্রহণ করা যায় না। কারণ বাঙালীর বাঙালা ভাষার পাঁচ সাত শ' বছরী অবিচ্ছিন্ন, অবিভক্ত মূলধারায় শ-ধ্বনিটি ছিল আনাত্মীয় বা foreign. তাঁদের লিখিত পুথি-পুস্ত কে তো বটেই, বাঙালা লিপির অনুক্রমেও তালব্য-শ নয়, দন্ত্য 'স'-র-ই ছিল অগ্রাধিকার। এর একটি দুর্লভ উদাহরণ ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে লিখিত হ্যালহেডের "এ কোড্ অব জেন্টু ল'জ"-এ ছাপা বাঙালা হরফের নমুনায় পাওয়া যায়। সেখানে বাঙালা বর্ণমালার যে-অনুক্রম দেখা যায়, তাতে "স,ষ,শ" র'য়েছে।* হস্তলিখিত নজীরে নিহিত এই 'স'-ই যে, 'বাঙালী'র মুখে ও কলমে চিরকাল 'শ'-ধ্বনি বা 'শিস্' ধ্বনির স্থান অধিকার ক'রে রেখেছিল তার প্রমাণ 'গৌড় লেখমালা'র প্রথম স্তবকে মুদ্রিত শিলালিপিতেও পাওয়া যায়। সেখানে "শিব" না লিখে" সিব" লেখা হ'য়েছে। এরকম নজীর ঐ সময় ও তার পরেকার অনেক লেখাতেই পাওয়া যায়। অতএব, বাঙালা লিপির ইতিহাসের দিক থেকেও 'স,' তালব্য-শ'-এর স্থলাভিষিক্ত একটি খাঁটি শিস্ ধ্বনি রূপেই 'বাঙালা' দেশে প্রাচীন কাল থেকে চালু ছিল এবং এখনও আছে। এটা কখনও 'ছ' এর ধ্বনি তুল্য ছিল না। বাঙালা লিপির ইতিহাস তাই ড. চট্টোপাধ্যায়ের মতের অনুকুল নয়।

সেজন্য ড. চট্টোপাধ্যায় যখন বলেন,—"প্রাদেশিক উচ্চারণ অনুসরণ" ক'রে 'পূর্ব-বঙ্গের (বর্তমান বাঙ্লাদেশ) বহু মুসলমান লেখক পূর্ব-বঙ্গে প্রচলিত ছ-এর এই s=(এস্) স্থানে স-এর বদলে 'ছ' লেখেন, তখন তা প্রাদেশিক প্রয়োগ এবং প্রাদেশিক উচ্চারণের জন্যই তা তাঁরা ক'রে থাকেন; তাই এসব ক্ষেত্রে "ছ"-এর

*. পরপৃষ্ঠায় দেওয়া লিপি-চিত্রটির ফটোকপি দেখুন।

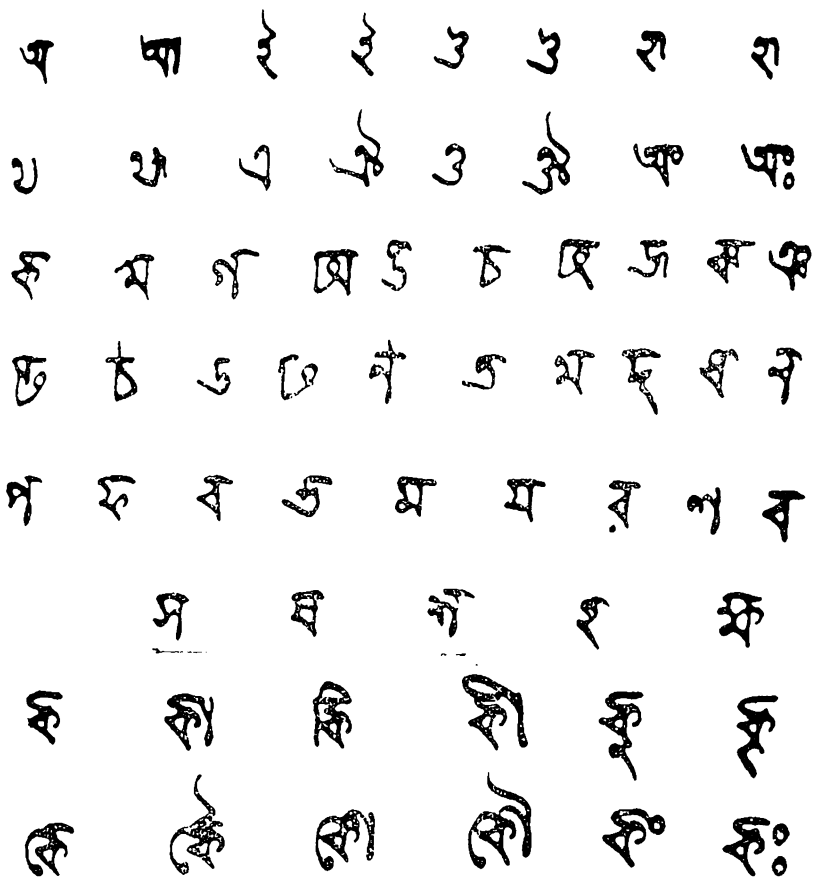

হলহেডের 'এ কোড অব জেণ্টু লজে' (১৭৭৬) ছাপা বাংলা হরফের নমুনা।

প্রয়োগ আপত্তিজনক'; তখন সে-কথা গ্রহণ করা যায় না। ড. চট্টোপাধ্যায়ের মতে—"পুরানো বাঙালায় যত আরবী-ফারছী নাম ও শব্দ প্রবেশ ক'রেছে' "সর্বত্রই s-এর ধ্বনি (অর্থাৎ ছে, ছিন ও ছোয়াদ) বাঙালায় স-রূপে" লিখিত হ'য়েছে। "প্রাচীন সাহিত্যে এর ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে।"

এসব উক্তির সঙ্গে তিনি যে-সব আরবী-ফারছী শব্দের বানানাদির নমুনা দাখিল ক'রেছেন, সেগুলো সম্পর্কে সচেতন থেকেই এবার ঐ ক'টি বক্তব্য পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

প্রথম দেখা যাক, **পূর্ব-বঙ্গে** তথা এদেশের মুসলিম লেখকদের রচনায় 'প্রাদেশিকতার কারণে' বা তাঁর মতে—'উচ্চারণ-বিকৃতির কারণে' ছে, ছিন ও ছোয়াদ-এর স্থলে 'ছ' লেখা হ'ত কিনা। অর্থাৎ এসব স্থানে ছ-এর ব্যবহার "প্রাদেশিক উচ্চারণজনিত" কি না। তাঁর নিজের দেয়া উদাহরণগুলোর কথাই ধরা যাক। যথা,—ছানাউল্লাহ, ওছমান, নাছিরুদ্দীন, ছোলতান, খাদেমুল এনছান; গয়াছ উদ্দীন, নছরত, হুছেন, ছিরাজ, ছুলেমান ইত্যাদি। তারপর দেখা যাক তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী **"পশ্চিম-বঙ্গে"** "(ভারতীয় বাঙালায়)" " মুছলমান" বানান থেকে "মোচরমান ও "কিচ্ছা থেকে " "কেচ্ছা", "মরছিয়া" থেকে' "মর্চে", "মিসিল" থেকে "মিছিল", "ওয়াসিলা" থেকে 'অছিলা", "পসন্দ" থেকে "পছন্দ", "অকসর" থেকে "আকছার", "তসররুফ" থেকে "তছরুপ" প্রভৃতি বানান ওখানকার প্রাদেশিক রূপ বা বিকৃত বানান কিনা।

ড. চট্টোপাধ্যায় যে- সব শব্দরূপ 'পূর্ব বঙ্গীয়' ব'লে উল্লেখ ক'রেছেন, সেগুলো যে, আসলে 'সর্ব বঙ্গীয়' বা সারা বাঙালার-ই সাহিত্যিক ভাষা-রূপ ছিল, তা ঢাকা ও কোলকাতায় বিশ শতকের গোড়ার দিকে মুদ্রিত শুদ্ধ পুথি-কেতাব দেখলেও বোঝা যায়। ছানাউল্লাহ, নাছিরুদ্দীন, ওছমান, ছোলেমান, ছোলতান, গিয়াসুদ্দীন, নছরত, হুছেন, বা হোছেন, ছিরাজ, ছুলেমান বা ছোলেমান শব্দসমূহ কেবল এ-বাঙালায় ছাপা ও লেখা পুথি- কেতাবে নয়, ভারতীয় বাঙালায় লেখা ও ছাপা বই-কেতাবেও পাওয়া যায়। ড. চট্টোপাধ্যায় যদি একটু কষ্ট ক'রে, অশুচি বোধ ত্যাগ ক'রে, মুছলিম পুথি-পত্র—অন্ততঃ ছাপা, শুদ্ধ এবং ইতিহাস বিষয়ক পুথি-কেতাব দু'একখানা দেখতেন, তাহ'লে এর প্রমাণ পেতেন। তিনি আরও দেখে অবাক হ'তেন যে, ১৮০১খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত তো বটেই; তার পরও প্রায় এক শ' বছর পুথির ভাষাই ছিল মুছলিম-হিন্দু, উভয় জনগোষ্ঠীর-ই সাধারণ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 'কমন' (common) ভাষা । আর পূর্ব-পশ্চিম উভয় বাঙালার জনগণের শিষ্ট উচ্চারণ-রূপটিই তাতে ব্যবহৃত হ'ত। এর নজীর হাজির করার আগে, ড.

চট্টোপাধ্যায় আরবী -ফারছীর ছে, ছিন ও ছোয়াদ-যুক্ত যে-সব শব্দের উল্লেখ ক'রেছেন, সে-গুলো একত্র করা যাক। তাঁর নমুনামূলক শব্দ হ'ল—শাহ্, শরীফ, মুশর্‌রফ, মুর্শিদ, দানিশ্‌মন্দ, সনাউল্লা, ওসমান, সুলতান, সূফী, অস্‌ঘর, নাসিরুদ্দীন, গিয়াসুদ্দীন, নসরৎ, হুসেন, সিরাজ, সনদ, সন, সাল, সরাই, সেপাই, সাবেক, সুরখি, সাজা, সালিস, সান, সরহদ্দ, মফঃস্বল, সানকি, সবুর, সহি, খানসামা, তমসুক, মুসলমান, রসদ, আসমান, খাসী ইত্যাদি।

এবার দেখা যাক, এসব শব্দের বানানের প্রকৃত ঐতিহাসিক রূপ কি। প্রথমেই 'শাহ্' শব্দের বানান দেখানো চলে। অনেকেই জানেন, বিখ্যাত ফারছী কবি ফেরদৌছীর মহাকাব্য "শাহ্ নামা" এ-দেশে পহেলা মুছলিম করিরাই তরজমা করেন। এই বিশাল মহাকাব্যের বাঙালা নাম ছিল "সাহা নামা"—'শাহা নামা' নয়।

উক্ত মহাকাব্য থেকে উদ্ধৃত নিম্নোক্ত চরণসমূহের প্রতি দৃষ্টি দান করা দরকার। যথা—

"তাজ তক্ত সাহি মেরা নাহি দরকার ॥
সাহি মোবারক তুঝে রহে নামদার ✶
আমা হৈতে জে কাম হইবে জাহাগির ॥
কমি না করিব তাতে না হেলাব ছির ✶
আবজাস্প সাহার তরে ডালিব মারিয়া ॥
আনিব বহিনদিগে খালাছ করিয়া ✶
সুনিয়া গোস্তাস্প সাহা বাদসা জাহাগির ॥
হাজার সাবাসি দিল বেটার খাতির ✶
জাহ বাবা লিয়া এবে লস্কর ছেফাই ॥
খোদাকে সুপিয়া তুঝে করিনু বিদায়✶"[১]

এই কোটেশনে নিম্নরেখ শব্দগুলোয় স্পষ্ট রূপে সাহা, সাহি, ছেপাই, ছির, খালাছ বানান দেখা যায়।

এবার কোলকাতা থেকে প্রকাশিত (১৯২৬) সেখ মোহাম্মদ মুন্‌সী-বিরচিত "সহিদে কারবালা" নামক গ্রন্থের নিম্নোক্ত কোটেশন সমূহের প্রতি নজর দান করা যাক।

১. দ্র ঃ সহানামা, পৃষ্ঠা-৭৪।

১. "বেহেস্ত দোজখ আর জেন ও এনছান ॥
মেরা নূরে পয়দা হৈল তামাম জাহান ★"[৭]

২. "তার পর হজরত আদম ছফি হৈতে ॥
শিস পয়গম্বরে আইল পেসানিতে ★"[৮]

৩. "মক্কা সহরের লোকে সকলে ডাকিয়া ॥
দেলাইতেন খানা সকলে মেহমানি করিয়া ★"[৯]

৪. "আছমান হৈতে এক আতস আসিয়া ॥
কোরবানির গোস্তকে জাইবে জ্বালাইয়া ★"[১০]

৫. "এই তক হাদিছেতে লিখিয়াছে ছাফ ॥
এ সকল নামে কিছু নাহি এক্তেলাফ ★"[১১]

উক্ত পাঁচটি শ্লোকের নিম্নরেখ শব্দসমূহ পষ্টই ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের তথ্য-বিরোধী। এরকম আরও নজীর—

১. "বন্দিনু ওছমান গনি বড় হায়দার ॥
ওক্মার খাত্তাব আর আলি জোরওার ★"[১২]

২. "হাছেন হোছেন বন্দি পেয়ারা নবির ॥
জা দিগে কছেল্লা দিল এজিদ বেপীর ★
বন্দিনু আমির হামজা বড়া জোরওার ॥
আর জত সহিদানে ছালাম আমার ★"[১৩]

৩. "তার ওছিলায় জত/পয়দা কৈল তত ॥"[১৪]

৪. "এজিদের ডর বুঝি নাহি তেরা দেলে"
আপনার দিন ছেড়ে মোছলমান হৈলে ★"[১৫]

৫. "তিন জনা বিচে এক আলি আছগর ॥
সেহ তো দুধের ছেলে কেতাবে খবর ★"[১৬]

---

৭. দ্র ঃ সহিদে কারবালা, পৃষ্ঠা-৩৮১।
৮. — ঐ, পৃষ্ঠা-ঐ।
৯. — ঐ, পৃষ্ঠা-ঐ।
১০. — ঐ, পৃষ্ঠা-৩৮২।
১১. — ঐ, পৃষ্ঠা-৩৮৩।
১২. — ঐ, পৃষ্ঠা-৩।
১৩. — ঐ, পৃষ্ঠা-ঐ।
১৪. — ঐ, পৃষ্ঠা-ঐ।
১৫. কাছাছোল অম্বিয়া, পৃষ্ঠা-১৩৬।
১৬. —ঐ, পৃষ্ঠা-৫৫৮।

৬. ''কয় রোজ হৈতে মেরা আলি আছগর ॥
ভোকের সেদ্দত আর পিয়াছে ফাঁপর ★''
খানাপানি এনে কিছু খেলাও আছগরে ॥
সুখাইল দুধ মেরা নাহি ছাতি পরে ★''[১৭]

উক্ত ছ'টি কোটেশনের মধ্যে নিম্নরেখ শব্দগুলো তো বটেই সেই সঙ্গে শেষোক্ত কোটেশনের ''আছগর'' বা ''আছগার'' শব্দটির তিন বার এক-ই রকম উল্লেখ থেকে ড. চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য আদৌ সমর্থন করা যায় না।

অতঃপর কোলকাতা থেকে মুদ্রিত আর একখানি মহাগ্রন্থ ''কাছাছোল আম্বিয়ার'' সংক্ষিপ্ত সংস্করণ থেকে উদ্ধৃত নিম্নোক্ত চরণগুলো লক্ষ্য করা যেতে পারে ।

১. ''আম্বিয়াগণের কেচ্ছা বড়ই মধুর ॥
কেচ্ছার খাহেস যার শুনিবে জরুর ★
এ নহে 'ফাছেকি কেচ্ছা কোরানে মজকুর ॥
যে শুনিল দেল তার হৈল চুর চুর ★
ইহার আওয়াজ গেল যত দূর দূর ॥
চমকিয়া গেল সব এছলামের নূর ★''[১৮]

২. ''আব্বাছের ফরজন্দ কাছেম যার নাম ॥
রওায়েত করিয়াছে এরূপ কালাম ★
যেই রোজ নুরনবী ছাহেবে জাহান ॥
এন্তেকাল ফরমাইল শোন সে বয়ান ★
তামাম আলম হৈল শোকে জার জার ॥
বহিল আছুর নদী আখে সবাকার ★''[১৯]

এবার ঢাকা থেকে প্রকাশিত মৌলবী আবদুল আজিজ-এর লিখিত ''ওয়ারেছ আম্বিয়া''র নিম্নোক্ত 'কোটেশন' লক্ষণীয়।

''ফয়ছলার খোলাছা ও মফছেদের হছদ ★

''ফয়ছালার তরজমা জদি লইলে সুনিয়া ॥
ইহার খোলাছা তবে সোন দেল দিয়া ★

---

১৭. — পৃষ্ঠা-৩২১।
১৮. — পৃষ্ঠা- ৩২৪
১৯. — ঐ,পৃষ্ঠা-৫৫৮।

মওলানা কেরামত আলি মরসেদ সবার ॥
লেখিলেন তিনি এই ফছেলা মাঝার *

'ইজাহল হক' এক কেতাবের নাম ॥
ওহাবি লোগের কেহু লেখিল তামাম *
এই মত মিঞা মিঠু কহে গায় গায় ॥
আর ছৈয়দ ছাহেবের বুরা কহিয়া বেড়ায় *
ছেরাতল মোস্তাকিমেরে কহে সেই ঝুটা ॥"[২০] ইত্যাদি

এমনি ভাবে, ড. চট্টোপাধ্যায়ের লিখিত প্রতিটি শব্দের শুদ্ধ বাঙালা পাঠ কোট্ ক'রে দেখানো যায়, তাঁর পূর্বোক্ত আপত্তিসমূহের কোন ভিত্তি নেই। তিনি যদি একটু শ্রদ্ধার সাথে মুছলিম ও বৃটিশ আমলে মুছলমানদের লেখা পুথির শুদ্ধ পাঠ দেখতেন, তাহ'লে জানতে পেতেন যে, বাঙালার মূল ধারার সাহিত্যে চিরকাল-ই গয়স-এর স্থানে গেয়াছ/গ্যাছ (যেমনঃ "মহা নরপতি গ্যাছ পৃথ্বীর সার") নছরৎ, নছির, নাছির রূপ-ই পাওয়া যায়। প্রকৃত শুদ্ধ পাঠ এগুলোই।

অতএব, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যে-বানানকে "প্রাদেশিকতা "রূপে চিহ্নদান ক'রেছেন; তা কখন ও প্রাদেশিক বা অশুদ্ধ বানান ছিল না। ঐ বানান যে, আসামী ভাষায় এখনও চলে তার প্রমাণ আদৌ দুর্লভ নয়। যেমন—আমরা লিখি "ইসলামের ইতিহাস" কিন্তু অসমীয়ারা লেখেন "ইছলামর চিনাকী" (চানেকী)।

এসব নজীর থেকে স্পষ্টই বলা যায়, বাঙালা ভাষার ধ্বনিতত্ত্বের মূলধারা, লিপি ও বানান-এর ইতিহাস এবং সারা বাঙালার শত শত বছরের সকল কবি-লেখকের রচনার শুদ্ধ রূপকেই ড. চট্টোপাধ্যায় না-কবুল ক'রেছেন। কারণ তাঁর প্রস্তাবিত "ছে, ছিন ও ছোয়াদ-এর স্থানে 'স' নয়; "ছ"-ই ব্যবহার করা ছিল একটি প্রতিষ্ঠিত রীতি এবং তাঁর ভিত্তি ছিল সর্বজন-স্বীকৃত শুদ্ধ উচ্চারণ। ড. চট্টোপাধ্যায়ের ঐ প্রস্তাবিত বিধান ও তার অনুসরণ-ই এ-জাতীয় অসংখ্য আরবী-ফারছী ও উরদু শব্দকে মুছলিম কলম ও জবানের প্রচলিত ও স্বীকৃত সঠিক বানান-রীতির ঐতিহ্য থেকে সরিয়ে এনেছে।

তাঁর নজীর হিসেবে এবার মূল আরবী-ফারছী শব্দের ছে, ছিন ও ছোয়াদ এর বাঙালা রূপান্তর কি রূপ নিয়েছে তা আরও দেখা যেতে পারে।

২০. মৌলবি আবদুল আজিজ। ওয়ারেছে আম্বিয়া, পৃষ্ঠা-২১২।

	আরবী-ফারছী বানানে মূল শব্দ	কোন ভাষা	আরবী-ফারছী শব্দের ঐতিহ্যগত বাঙালা শুদ্ধরূপ			বর্ণান্তরের স্বরূপ
১.	شَاهْ	ফা	সাহা	শ	স্থানে	স
২.	شريف	আ	সরিফ	শ	”	স
৩.	مشرف	আ	মুসররফ	শ	”	স
৪.	مرشد	আ	মরসেদ (মুর্শিদ)	শ	”	স
৫.	دانشمند	ফা	দানিসমন্দ	নশ	”	স
৬.	ثناء الله	আ	ছানাউল্লা	ছ	”	ছ
৭.	عثمان	আ	ওছমান	ছ	”	ছ
৮.	سلطان	আ	ছুলতান	স	”	ছ
৯.	صوفی	আ	ছুফি (সূফী)	স	”	ছ
১০.	نصيرالدين	আ	নাছিরুদ্দীন	স	”	ছ
১১.	اصغر	আ	আছগর	স	”	ছ
১২.	انسان	আ	এনছান	স	”	ছ
১৩.	غياث الدين	আ	গিয়াছুদ্দিন	ছ	”	ছ
১৪.	نصرت	আ	নছরৎ	স	”	ছ
১৫.	حسين	আ	হোছেন	স	”	ছ
১৬.	سراج	আ	ছিরাজ	স	”	ছ
১৭.	سليمان	আ	ছুলেমান	স	”	ছ
১৮.	سند	আ	ছনদ (সনদ)	স	”	ছ
১৯.	سن	আ	সন (সন)	স	”	ছ
২০.	سال	ফা	সাল	স	”	স
২১.	مغشل	আ	মফস্বল	শ	”	স্ব
২২.	صبر	আ	ছবর	স	”	ছ
২৩.	مسلمان	ফা	মুছলমান	স	”	ছ
২৪.	رسد	ফা	রছদ (রসদ)	স	”	ছ
২৫.	اسمان	ফা	আছমান	স	”	ছ
২৬.	خاسی	আ	খাছি (খাসী)	স	”	ছ
২৭.	قصة	আ	কিচ্ছা (কেচ্ছা)	স	”	ছ

২৮.	اكثر	আ	আকছার	ث	''	ছ
২৯.	تصرف	আ	তছরুফ	ص	''	ছ
৩০.	ثابت	আ	ছাবিত	ث	''	ছ
৩১.	ثالث	আ	ছালিছ	ث	''	ছ
৩২.	ثبوت	আ	ছাবুত	ث	''	ছ
৩৩.	صواب	আ	ছওয়াব	ص	''	ছ
৩৪.	ثناء	আ	ছানা	ث	''	ছ
৩৫.	ثانى	আ	ছানি	ث	''	ছ

এ-সব শব্দ বৃটিশপূর্ব আমলে এবং বৃটিশ আমলের প্রথম ভাগে—পূর্বোক্ত রূপে 'ছ' (ছে, ছিন ও ছোয়াদ স্থলে) দিয়েই লেখা হ'ত। ছাপা পুস্তকেও সর্বত্র প্রায় ব্যতিক্রমহীন ভাবে এ-বানান-ই পাওয়া যায়। আর 'শিন' স্থানে পাওয়া যায় ''স''। উপরে আলোচিত শব্দাবলীর মত হাজার হাজার শব্দের লিখিত সঠিক বাঙালা রূপ দ্বারা প্রমাণ করা যায়, প্রকৃত বাঙালীদের অকৃত্রিম বাঙালা কলমে সর্বদাই এবং সর্বত্রই ছে, ছিন ও ছোয়াদ স্থানে 'ছ' ব্যবহৃত হ'য়ে এসেছে , আর শিন-(ش) এর স্থলে ব্যবহৃত হ'য়ে এসেছে ''স''। এখানে প্রাদেশিকতার কোন প্রশ্ন নেই। 'লোয়ার বেঙ্গল', 'আপার বেঙ্গলে'রও নেই কোন ভেদ। খোদ্ ঢাকা ও কোলকাতা থেকে প্রকাশিত শত শত মুছলিম পুথি-কেতাব থেকে তার নজীর দেওয়া যায়। ফলে, ঐ সব বানান ছিল, সারা বাঙালার-ই সর্বজনমান্য, সর্বস্বীকৃত বা অবিতর্কিত বানান। তাই ড. চট্টোপাধ্যায়-কথিত ''পশ্চিম বঙ্গে'' মোছলমান বানান থেকে ''মোচরমান'' বানান হয়নি; ওটা হ'য়েছে ''মুছলমান''–বিদ্বেষের কারণে। 'মুছলমান' ঐ অঞ্চলে কেবল 'মোচরমান' নয়; 'মোচলমান; 'মুছলা', 'ম্লেচ্ছ'ও হ'য়েছে। মরছিয়া বানান থেকেও 'ম'রচে' আসেনি। এটা বিকৃত উচ্চারণের কারণেই হ'য়েছে। ওছিলা, আকছার, পছন্দ, তছরুফ, কেচ্ছা এগুলো খোদ্ কোলকাতা শহর থেকে প্রকাশিত পুথি-কেতাবের শুদ্ধপাঠেও পাওয়া যায়। পূর্বোক্ত কোটেশনগুলোই তার অকাট্য প্রমাণ। ডঃ চট্টোপাধ্যায় যে-সব আরবী-ফারছী শব্দের বাঙালা রূপ পশ্চিম বঙ্গে ''পাই না'' ব'লে উল্লেখ ক'রেছেন; সেগুলো সেখানে তো পাওয়া যায়-ই—অধিকন্তু সমোচ্চারিত বা প্রায়-সমোচ্চারিত হিন্দু ব্যক্তিনামও 'স' স্থানে 'ছ' দিয়ে লেখার নজীর আছে—তখনকার 'পশ্চিম বঙ্গ' থেকে প্রকাশিত পঞ্চানন মণ্ডলের 'বাংলা সামাজিক চিঠিপত্র'' ২য় খণ্ডে। এতে সতের, আঠারো ও উনিশ শতকে লেখা পশ্চিম বঙ্গীয় অনেক হিন্দুনাম ঐ ভাবে লেখা; যেমন ''সৃষ্টিধর'' নয় ''ছিষ্টীধর (মণ্ডল)। মুসলিম নাম এবং স্থানাদির নামও এধারা থেকে বাদ যায়নি।

এভাবে কেবল বাঙালায় নয়; মুছলিম আমলে—আসামী, উড়িয়া, মৈথিলী, বিহারী, হিন্দুস্তানী বা উরদু, হিন্দী প্রভৃতি সমস্ত ভারতীয় ভাষায় নিহিত আরবী-ফারছী শব্দ ড. চট্টোপাধ্যায়ের দাবী অনুযায়ী 'স' (ছে, ছিন ও ছোয়াদ স্থানে) দিয়ে নয়; 'ছ' দিয়েই লেখা হয়। উচ্চারণও করা হয়—এক-ই রীতিতে; সংস্কৃত-রীতি অনুযায়ী নয়। ১৮০১ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঙালা বিভাগের পণ্ডিতদের মারফত সংস্কৃতের দানব, বাঙালা ভাষা ও বাঙালীর ঘাড়ে চেপে বসার পূর্ব পর্যন্ত অবস্থা এরকম-ই ছিল। ব্যাপারটি যে, তারপরও এক শ'-সোয়া শ' বছর যাবৎ মুছলমান কবি-মুছান্নেফগণ চলমানধারা অব্যাহত রেখে—ভাষা ও সাহিত্য-চর্চা ক'রে গেছেন এবং ছে, ছিন ও ছোয়াদ স্থানে 'ছ'-ই লিখেছেন, তা সত্য।

তথাপি ড. চট্টোপাধ্যায় আরও লিখেছেন, এতদ্ভিন্ন মূল আরবীতে ছিন, ছে ও ছোয়াদ-এর উচ্চারণ পৃথক পৃথক। ছে-র আরবী উচ্চারণ হ'চ্ছে দন্ত্য 'স'-ঘেঁষা উষ্ম (?) থ, ইংরেজী think-এর th-এর মত। ছোয়াদ কতকটা স্ব বা sw-এর মত। 'ছিন' হইতেছে খাঁটি দন্ত্য 'স'।

এখানে ড. চট্টোপাধ্যায় যে, নতুন ধ্বনিতত্ত্বের অবতারণা ক'রেছেন, তা শুধু দুর্বোধ্য নয়; স্ববিরোধীও বটে। হয়তো তাঁর এই নতুন তালিম-এর জন্য তদীয় ছাত্র মরহুম ড. এনামুল হক তাঁর "বাঙ্গালার সূফীবাদ" -গ্রন্থে ছুফী শব্দের বানান "স্থূফী" লিখতে বাধ্য হন। "তাছাউফ'কে লেখেন "তস্থুফ্"।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আরবী-ফারছীর ছে, ছিন ও ছোয়াদ-এর উক্ত চরম অসংগত ধ্বনি-নির্দেশের পর জাল, জে জোয়াদ এবং জোই সম্পর্কে লিখেছেন—আরবীতে 'জোই', দোয়াদ, জে ও জাল'-এর উচ্চারণ ফারছী-উরদুতে একমাত্র z হ'লেও আরবীতে এক নয়। আরবীতে জে-এর উচ্চারণ z আর-গুলোর উচ্চারণ পৃথক। জাল= ধ, জোয়াদ দ্ব, জোই=ধ্ব-জাতীয়।'

কিন্তু ইতোপূর্বে লিখিত আমার 'আঠারো হরফে বাঙালা লেখন'-এর বর্ণ-সমীকরণকারী সারণিতে—এর বিপরীত তথ্যই উপস্থাপিত হ'য়েছে। নিম্নে দুটো তালিকা পাশাপাশি তুলে ধরা হ'ল।

মূল আরবী বর্ণ	ড. চট্টোপাধ্যায়-প্রস্তাবিত বর্ণটির রূপ		মুছলিম গবেষকদের গৃহীত বর্ণান্তর-এর রূপ
ذ (জাল)	=z	(ফা-উ)	জ
	=ধ	(আ)	
ز (জে)	=z	(ফা-উ)	জ
	=z	(আ)	

ض	(দোয়াদ	=z	(ফা-উ)	জ/দ
	বা জোয়াদ)	=দ্ব	(আ)	
ظ	(জোই)	=z	(ফা-উ)	জ
		=ধ্ব	(আ)	

এবার দেখা যাক, আরবী-ফারছী ভাষায় সুবিজ্ঞ মুছলিম কবি-মুছান্নেফগণ তাঁদের রচনায় ঐ সব বর্ণ- (ض ظ ز) যুক্ত শব্দ বাঙালায় লেখার সময় কি-তরতিব অনুসরণ ক'রেছেন। নজীর হিসেবে নিচের শব্দগুলোর প্রতি নজর আকর্ষণ করা যায়।

ক. **জাল (ذ) যুক্ত ছ'টি শব্দ**

(১)	ذكير	জাকির
(২)	ذرة	জর্‌রা
(৩)	ذلت	জিল্লৎ
(৪)	ذمة	জিম্মা
(৫)	ذمى	জিম্মি
(৬)	ذالقعدة	জিল্‌কদ্

খ. **জে - (ز) ওয়ালা ছ'টি শব্দ**

(১)	روزا	রোজা
(২)	روز	রোজ
(৩)	زخم	জখম
(৪)	زائدة	জায়েদা
(৫)	زبور	জাবুর
(৬)	زبان	জবান

গ. **জোই (ظ) যুক্ত ছ'টি শব্দ**

(১)	ظهير	জাহির
(২)	ظلمة	জুলকাত
(৩)	ظلم	জুলুম
(৪)	ظهر	জোহর
(৫)	ظهورا	জহুরা
(৬)	ظهير	জহীর

ঘ. জোয়াদ (ض) ছ'টি যুক্ত শব্দ

(১)	ضمير	জমির
(২)	ضياء	জিয়া
(৩)	ضيافة	জিয়াফত
(৪)	ضامن	জামিন
(৫)	ضد	জিদ
(৬)	ضرور	জরুর

এবার ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের উক্ত বক্তব্য আলোচনার পর তাঁর লিখিত বিশেষ-মন্তব্যটি পরীক্ষা করা যাক। তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত-বাক্যে আপন মন্তব্য প্রকাশ ক'রে লিখেছেন——

"বিশুদ্ধ আরবী উচ্চারণ যখন বাঙ্গালা ভাষাতে লেখা সম্ভব হইবে না, তখন ছ -এর ব্যবহার দ্বারা বিদেশী নামে chh ও z-এর গোলমাল সৃষ্টি করার কোনও সার্থকতা নাই।" তার সোজা অর্থ মুছলমানদের আরবী, ফারছী শব্দের মুছলমান-নামে পরিচয় দেয়ার কোন সার্থকতা নেই। যে-নাম লেখা সম্ভব নয়, তা রেখে লাভ কি?

ড. চট্টোপাধ্যায়ের "বিদেশী" আরবী-ফারছী নাম সম্পর্কে প্রদত্ত এ-প্রস্তাব উত্তম ও নিরপেক্ষ হ'ত; যদি তিনি এক-ই সঙ্গে বাঙালী অমুছলিমদেরও 'সংস্কৃত নাম' নিয়ে আলোচনা ক'রতেন এবং ব'লতেন যে, বিদেশী সংস্কৃত ভাষার ঐ সব নামও বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ অনুযায়ী—লেখা যায় না; বলা যায় না ব'লে; ঐ সব নাম বাঙালায় রাখার কোন সার্থকতা নেই। কারণ তিনি না ব'ললেও, তাঁর গুরু স্যার জর্জ গ্রীয়ার্সন পরিষ্কার ভাষায় লিখে গেছেন—"The Bengalee Vocal organs are not adapted to the pronunciation of Sanskrit words and to those words spell one thing, and when read aloud, sound something quite different."[২১]
তরজমাঃ 'বাঙালীর বাগ্‌যন্ত্র সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণের উপযোগী নয়। ঐ সব শব্দ যখন লিখিত হয় এক রকম এবং তার পর যখন জোরে পড়া হয়; তখন তা একেবারেই অন্য রকম কিছু শোনায়।' এমনকি, বাঙালী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরাও যে, সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণ ক'রতে পারেন না; সে কথাও ড. গ্রীয়ার্সন লিখে গেছেন। বাঙালীদের সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণের অপারগতার কথা মহা-মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও কবুল ক'রেছেন। ——তা আগেই বলা হ'য়েছে।

২১. স্যার জর্জ গ্রীয়ার্সন। দি ইন্ডিয়ান এম্পায়ার, পৃঃ ৩৭৭।

এ-অবস্থায় বাঙালীর সংস্কৃত পড়া এবং ঐ বিদেশী ভাষায় নাম রাখা উচিত নয় ব'লেও ড. চট্টোপাধ্যায়ের উল্লেখ করা উচিত ছিল।

তারপর বলা দরকার—আরবী, ফারছী, সংস্কৃত, ইংরেজী, বাঙালা প্রভৃতি বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আরবী-ফারছী মুছলিম ঐতিহাসিক নাম-শব্দ নিয়ে আলোচনা ও বিধি-নির্দেশ ক'রতে গিয়ে আরবী-ফারছীর শব্দ, অক্ষর ও ধ্বনির মধ্যে শুধু ধ্বনি নিয়ে কেন আলোচনা ক'রলেন; এক একটি শব্দ নিয়ে কেন ক'রলেন না; তা বোঝা কঠিন। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ জানেন যে, হরফ দিয়ে ধ্বনি, স্বর ও শব্দ প্রকাশিত হয়। আধুনিক ভাষাতত্ত্ববিদ্যার ফোনিম্ Phonim-এর কথা বাদ রেখে বলা যায়, মানুষের মনে বা অভিধানে নিহিত শব্দ যখন উচ্চারিত হয়, তখন তার ধ্বনি, স্বর ও সুর—শব্দটির অবয়বে প্রকাশিত হয়। শব্দের সুর বা ঢংয়ের রূপটি ফোটে বাক্য গঠনকালে এবং সংগীত-রূপায়ণে। নাম-শব্দগুলো সংগীত ও বাক্যে ব্যবহৃত ও উচ্চারিত হওয়ার সময় এরূপ ঘটে। কিন্তু বাক্য-বিচ্ছিন্ন কোন শব্দই স্বর-সুর বা ধ্বনি প্রকাশ করে না। আওয়াজ প্রকাশ করে মাত্র। তবু তাকে শব্দধ্বনি বলা হয়। ড. চট্টোপাধ্যায় সেই অর্থে আরবী, ফারছী শব্দের ধ্বনি-(শব্দধ্বনি) বিচার করেননি। তিনি বর্ণ-সংযুক্ত ধ্বনি-বিচার ক'রেছেন অত্যন্ত অসংগত ভাবে। তার এই স্ব-বিরোধী, ইতিহাস-বিরোধী, ভাষাতত্ত্ব-বিরোধী ও ধ্বনিতত্ত্ব-বিরোধী পরামর্শগুলো পরবর্তী বাঙালা ভাষা ও সাহিত্যের এবং সেই সঙ্গে মুছলমানদের কী অপূরণীয় ক্ষতি ক'রেছে; তা পরবর্তী আলোচনা থেকে বোঝা যাবে।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'সহজ পদ্ধতি'র কঠিন পরিণাম

এবার ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পূর্বোক্ত ব্যাকরণে লিখিত প্রতিবর্ণায়নের "সহজ পদ্ধতি" আজ গোটা বাঙালা সাহিত্যে তো বটেই, সেই সাথে অবিভক্ত বাঙালার গোটা জনসমাজে কি শব্দ-বিপর্যয়, লেখন -(বানান) বিপর্যয় ও উচ্চারণ-বিপর্যয় ঘ'টিয়েছে—তা দেখা আবশ্যক। তাঁর ঐ "সহজ পদ্ধতি"র বানান-রীতি ভারতীয় বাঙালা ও বাঙলাদেশ-এর সকল শিক্ষিত মানুষকেই কেবল বাঙালা ভাষায় আরবী, ফারছী ও উরদু শব্দ লিখতে, প'ড়তে, ব'লতে ভুল পথে পরিচালনা করেনি; সেই সাথে তা উভয় রাষ্ট্রের অশিক্ষিত জনসমাজকেও সাথী ক'রে নিয়েছে। কিন্তু এদের মধ্যে সব চেয়ে বেশী ক্ষয়-ক্ষতির ভাগীদার হ'য়েছে—মুছলমানরাই। তাঁরা ড. সুনীতিকুমারের আইন অনুসরণ ক'রে লিখতে গিয়ে যে-সব ক্ষতি ও সমস্যার মুখোমুখী হ'য়েছে; তা হ'ল—

১. বাঙালা ভাষায় আরবী, ফারছী ও উরদু শব্দ লেখার সুপ্রতিষ্ঠিত, সর্বজন স্বীকৃত, অবিতর্কিত, বিকল্পহীন ধারার ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুতি। তাঁরা ড, চট্টোপাধ্যায়ের আইন মেনে লিখতে গিয়ে আসলে 'সহজ পদ্ধতি' ছেড়ে দিয়ে কঠিন থেকে কঠিনতর পদ্ধতি কবুল ক'রেছে বা ক'রতে বাধ্য হ'য়েছে।

২. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'গাইড্ লাইন' তাদের বৃটিশ আমলের দু'শ বছরের ভাষা ও সাহিত্য-চর্চার মূলধারাকে না-কবুল বা অশ্রদ্ধা ও উপেক্ষা করার প্রেরণা জুগিয়েছে। আর সেই সাথে সারা বাঙালার অবিচ্ছিন্ন ভাষা ও লেখন-রীতি এবং উচ্চারণ ও পঠন-পদ্ধতিকে—'বিভ্রান্তিকর', 'প্রাদেশিকতা', 'বিকৃতি' ইত্যাদির নামে দ্বি-দেশ ও দ্বিজাতিতত্ত্বে বিভক্ত ক'রে দিয়েছে। ফলে, আরবী, ফারছী ও উরদু শব্দের বাঙালা-লেখনে খোদ্ মুছলমানরাই দ্বিধা-বিভক্ত হ'য়ে প'ড়েছে।

৩. এ-বিভক্তি থেকে উচ্চ শিক্ষিত মুছলমানরাও আত্মরক্ষা ক'রতে পারেননি। যে-সব আধুনিক মুছলিম ভাষাতত্ত্ববিদ্—'মাদ্‌রাছা-লাইন' ও 'জেনারেল লাইন-এ সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী; তাঁরাও ড.সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পূর্বোক্ত হুকুমনামার নিচেয় দস্তখত ক'রতে বাধ্য হওয়ায়, তাঁরাও গত ১৯৪৭ সাল থেকে এ-দেশে বাঙালায় আরবী, ফারছী, উরদু শব্দের ভাষান্তরে দিশেহারা হ'য়ে প'ড়েছেন। এখনও তাঁরা সঠিক পথ খুঁজে পাননি।

৪. এ-সব ব্যক্তির মধ্যে যাঁরা যত বেশী তথাকথিত আধুনিক বাঙালা-(যা আসলে সংস্কৃত-ৰাঙালা)র চর্চায় অভ্যস্ত; তিনি তত বেশী ঐ সব শব্দের ভুল উচ্চারণ ক'রে থাকেন ও ভুল বানান লিখে থাকেন।

৫. এ-ঘটনা কেবল বাঙালায় আরবী-ফারছী ঐতিহাসিক নাম-শব্দেই সীমিত থাকেনি; তা প্রায় সমস্ত মুছলিম নামশব্দেই ছড়িয়ে প'ড়েছে। সেই সাথে তা ছড়িয়ে প'ড়েছে, অপরাপর সাধারণ আরবী, ফারছী ও উরদু শব্দেও।

৬. কেবল মুছলিম নামের ক্ষেত্রে হালফিল অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে, তা এই তথ্য থেকে জানা যাবে যে; কিছু দিন আগে আমার অফিসে এসে এক জন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি নিজের পরিচয় দিতে বলেন—"স্যার আমি "শামাদ" (ছামাদ)। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পদ্ধতি অনুযায়ী যদি "ছামাদ" শব্দটি "সামাদ' লেখার রেওয়াজ চালু না হ'ত; তাহ'লে তিনি নিজের নাম ঠিক ভাবেই উচ্চারণ ক'রতে পারতেন; ভুল ভাবে উচ্চারণ ক'রতেন না। "শামাদ" ব'লতেন না। এরপর একদিন টেলিফোনে শুনতে পেলাম—"এটা কি আষ্‌ঘোর সাহেবের বাসা?" "আছগর"

শব্দটি যদি সুনীতিকুমারের "অস্‌ঘর" এই 'শুদ্ধ" উচ্চারণের লাইন ধ'রে, তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী "আসগর" লেখা শুরু না হ'ত; তাহ'লে আজ কেউ 'আছগর'কে "আষ্‌ঘোর" উচ্চারণ ক'রত না। এরপর একদিন ইটিভির একটা সরেজমিন প্রতিবেদনে মুন্নি সাহাকে ব'লতে শুনলাম—জার্মানীর একজন বাঙলাদেশী "শামশুল করীমের" সাফল্যের কথা। "সামছুল" যদি "শামসুল" লেখার ধারা চালু না হ'ত; তাহ'লে সে-কালের মত এ-কালেও আমরা মুছলিম-অমুছলিম নির্বিশেষে সবার মুখেই সামছুল-ই শুনতে পেতাম। ' শামশুল' বা 'ছামছুল' নয়। আজ আরবী-ফারছী, উরদু ভাষার সাথে যাদের কিছু মাত্র সম্পর্ক নেই; তাঁরা অতি উচ্চ শিক্ষিত হ'য়েও লিখছেন,—'ইসলাম; প'ড়ছেন—'ইশ্‌লাম'; লিখছেন,—'মুসলমান', প'ড়ছেন—'মুষলমান'; লিখছেন,—'হোসেন', প'ড়ছেন—"হোশেন"; লিখছেন—'কাসেম'; প'ড়ছেন—'কাশেম'; লিখছেন—'নাসিমা', প'ড়ছেন—"নাশিমা"। 'মাসিমা'র সাদৃশ্যে নিশ্চয়-ই। এরকম বেশুমার নজীর হাজির করা যায়।

ঐ-সব নামের উচ্চারণের ক্ষেত্রে কেবল মাদ্‌রাছা-লাইনে শিক্ষিত, পারিবারিক রীতি-রেওয়াজে অভ্যস্ত এবং অল্পাধিক আরবী, ফারছী, উচ্চারণ-সচেতন ব্যক্তিরাই ভুল ভাবে লিখেও সঠিকভাবে উচ্চারণ ক'রে থাকেন। তাঁরা এখনও ইছলাম, মুছলিম, হাছান, হোছেন, কাছেম, নাছিমা-ই উচ্চারণ ক'রে থাকেন, যদিও লেখেন ইসলাম, মুসলিম, হাসান; হোসেন, কাসেম, নাসিমা ইত্যাদি। কিন্তু এদের সংখ্যা অতি-দ্রুত ক'মে আসছে।

৭. আরও বলা দরকার যে, ড. চট্টোপাধ্যায়ের আইন মেনে কেবল মুছলিম ব্যক্তি-নাম নয়; বই-কেতাবের নাম, গাঁয়ের নাম, এলাকার নাম, দেশ-বিদেশের নাম, প্রতিষ্ঠানাদির নাম, এমন কি—উপাধি তক নানা রকমে বিকৃত হ'য়ে প'ড়েছে।। আরবী-ফারছী ও উরদু শব্দের সংস্কৃতায়নের পথে—বানান-বিকৃতির ধারায় যে, এ-রকম দশা ঘ'টেছে—তা সত্য।

৮. বর্তমানে এ-দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা থেকে আরবী, ফারছী ও উরদু ভাষা-শিক্ষার বুনিয়াদী স্তরটা সরিয়ে দেবার ফলে, এখন উচ্চশিক্ষা-রত মুছলমান ছাত্রদেরও আরবী, ফারছী শব্দের সঠিক উচ্চারণ লেখাবার ও শেখাবার সুযোগ নেই। যাঁরা এখন মাদ্‌রাছা থেকে প'ড়ে না এসে, প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পড়াশুনা চালিয়ে এসেছে; তাদের আরবী, ফারছী, উরদু শব্দে 'স'-এর উচ্চারণ 'ছ' শেখাতে গেলে হতাশ হ'তে হয়। তারা যেখানেই 'স' দেখে সেখানেই 'ছ' উচ্চারণ করে। যেমন সামসুল-কে বলে 'ছামছুল' 'সাহানামা'কে পড়ে 'ছাহানামা'.

'খোসমেজাজ'কে বলে 'খোছ মেজাজ'। শুধু তাই নয়—তাঁরা সংস্কৃতকে পড়ে 'ছংছকৃত'; সূর্য্যকে, 'ছুর্জ্জ' এবং এক-ই সাদৃশ্যে ইংরেজী শব্দ 'সিডিউল'কে, 'ছিডিউল'; 'সেক্সপীয়ার'কে ''ছেক্ছপিয়ার''; 'সারেং'কে, 'ছারেং' ইত্যাদি। এসব দেখে-শুনে, খুব জোর দিয়েই বলা যায়, এদেশে মুছলমানদের সঠিক ভাষায়, সঠিক উচ্চারণ ও লেখনের মাধ্যমে মর্যাদাপূর্ণ আত্মপরিচয় দিতে এবং সামগ্রিক ভাবে শিক্ষা-সাহিত্যের মান-উন্নয়ন ক'রতে হ'লে—আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার জেনারেল লাইনে অন্ততঃ দশম শ্রেণী তক বাধ্যতামূলক ভাবে আরবী, ফারছী ও উরদু ভাষা শেখাতে হবে। নইলে মুছলমান কেবল 'মুসলমানে' ঠেকে থাকবে না; তার পদোন্নতি হবে 'মুশলমান' থেকে 'মুষলমানে''। কারণ যে-বিছমিল্লায় কোন দিন গলদ ছিল না; সেই বিছমিল্লায় ''বিস'' (বিষ) ঢুকিয়ে যে-গলদ তৈরী ক'রে দেয়া হ'য়েছে—তা আজ 'জেনারেল লাইন' উপচে প'ড়ে—'মাদ্‌রাছা লাইন'কেও বিষাক্ত ক'রে ফেলেছে।

৯. আরও বলা দরকার যে, ১৯ ও ২০ শতকের এই বানান-সংস্কৃতায়ন কেবল আরবী, ফারছী এবং উরদু শব্দকেই নয়; ইংরেজী শব্দেকেও ছাড়েনি। সেজন্য ইংরেজীতে আমরা সংস্কৃতের মত লিখি এক নিয়মে; পড়ি অন্য রকমে। কিন্তু সে-আলোচনা বর্তমান প্রসঙ্গের আওতায় পড়ে না ব'লে; কেবল উল্লেখটুকু মাত্র ক'রে রাখা হ'ল।

১০. সব শেষে বলা দরকার ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের উক্ত প্রতিবর্ণায়নের অসংগত সহজ পদ্ধতি যদিও কেবল মুছলমানদের নাম-শব্দ নিয়ে বাতলানো হ'য়েছিল; তথাপি তাঁর আছর থেকে সমস্ত রকম আরবী, ফারছী ও উরদু নামশব্দ তো বটেই অপরাপর হাজার হাজার সাধারণ শব্দও রেহাই পায়নি। আর সেই বিকৃতির সংস্কৃতায়ন ঘ'টেছে—নানা রকমে, নানা, চেহারায়। নিচের আলোচনার ওপর নজর দিলেই তা বোঝা যাবে। যথা—

১. অকারণ যুক্তাক্ষর-ব্যবহার—

বিশ্লেষিত যুক্তাক্ষর	লিখিত শব্দরূপ	উচ্চারিত শব্দরূপ
১.১. ক্ক (ক্ ক)	মক্কা	মক্‌কা
	মক্কী	মক্‌কী
	হক্কুল	হক্‌কুল
	হাক্কানী	হাক্‌কানী

	টিক্কা	টিক্‌কা
	টক্কর	টক্‌কর
	ছক্কা	ছক্‌কা
	পাক্কা	পাক্‌কা
	বক্কার	বক্‌কার
	সিক্কা	সিক্‌কা
১.২. ক্ত (ক্‌ত)	এক্তিয়ার	এক্‌তিয়ার
	বক্তিয়ার	বক্‌তিয়ার
	মোক্তার	মোক্‌তার
	আক্তার	আক্‌তার
	বক্তার	বক্‌তার
	তক্তি	তক্‌তি
	আক্তারা	আক্‌তারা
	এক্তেলাফ	এক্‌তেলাফ
	এক্তেদা	এক্‌তেদা
	এক্তেদার	এক্‌তেদার
১.৩. গ্দ (গ্‌দ)	বাগ্দাদ	বাগ্‌দাদ
১.৪. ঙ্গ/ঙ্গ ৭(ঙ্‌গ)	বঙ্গাল	বঙ্‌গাল
	বাঙ্গাল	বাঙ্‌গাল
	বাঙ্গালা	বাঙ্‌গালা
	বাঙ্গালী	বাঙ্‌গালী
	কাঙ্গালী	কাঙ্‌গালী
	কাঙ্গাল	কাঙ্‌গাল
	মাঙ্গা	মাঙ্‌গা
	লঙ্গর খানা	লঙ্‌গর খানা
	জঙ্গল	জঙ্‌গল
	মাহিমাঙ্গা	মাহিমাঙ্‌গা
১.৫. চ্চ (চ্‌চ)	বাচ্চা	বাচ্‌চা
	ছাচ্চা	ছাচ্‌চা
	গচ্চা	গচ্‌চা

	কাচ্চা	কাচ্চা
	কাচ্চি	কাচ্চি
১.৬. চ্ছ (চ্ছ)	আচ্ছা	আচ্ছা
	লাচ্ছা	লাচ্ছা
	কিচ্ছা	কিচ্ছা
	মুফাচ্ছির	মুফাচ্ছির
	মুদাচ্ছের	মুদাচ্ছের
	মুনাচ্ছিব	মুনাচ্ছিব
১.৭. জ্জ (জ্জ)	হজ্জ্ব/হজ্জ	হজ্
	মোয়াজ্জম	মোয়াজ্জম
	ইজ্জৎ	ইজ্জৎ
	বজ্জাৎ	বজ্জাৎ
	হাজ্জাম	হাজ্জাম্
	রাজ্জাক	রাজ্জাক
	দজ্জাল	দজ্জাল
	বিমজ্জিম	বিমজ্জিম্
	রজ্জব	রজ্জোব
	মজ্জুবি	মজ্জুবি
১.৮. ঞ্জ (ঞ-জ)	আঞ্জাম	আন্জাম
	মঞ্জিল	মন্জিল
	কঞ্জুস	কন্জুস
	তাঞ্জাম	তান্জাম
	খিঞ্জীর	খিন্জির
	জিঞ্জির	জিন্জির
	বঞ্জর	বন্জর
	খঞ্জর	খন্জোর
	আঞ্জীর	আন্জীর
	গঞ্জ	গন্জ
১.৯. ত্ত (ত্ত)	ছাত্তার	ছাত্তার
	ছেত্তা	ছেত্তা
	বেত্তা	বেত্তা

	কিত্তা	কিত্‌তা
	এত্তেলা	এত্‌তেলা
	মুত্তালিব	মুত্‌তালিব
	ইত্তেহাদ	ইত্‌তেহাদ
	ইত্তেফাক	ইত্‌তেফাক
	ইত্তেসাল	ইত্‌তেসাল
	মুত্তাকীন	মুত্‌তাকীন
১.১০. দ্দ (দ্‌দ)	শাদ্দাদ	শাদ্‌দাদ
	হদ্দ	হদ্‌দো
	মুদ্দৎ	মুদ্‌দৎ
	শীদ্দৎ	শীদ্‌দৎ
	ইদ্দৎ	ইদ্‌দৎ
	গাদ্দার	গাদ্‌দার
	দুদ্দু	দুদ্‌দু
	কতুবুদ্দীন	কুতুবুদ্‌দীন
	তছদ্দুক	তছদ্‌দুক
	মোহাদ্দিছ	মোহাদ্‌দিছ
১.১১. ন্ত (ন্‌ত)	এন্তেজাম	এন্‌তেজাম
	এন্তেজার	এন্‌তেজার
	মোন্তাজ	মোন্‌তাজ
	এন্তার	এন্‌তার
	ইন্তাজ	ইন্‌তাজ
	ইন্তিফাদা	ইন্‌তিফাদা
	আন্তাবুদু	আন্‌তাবুদু
	ফান্তারাহু	ফান্‌তারাহু
	মুন্তাখাব	মুন্‌তাখাব
১.১২. ন্দ (ন্‌দ)	খান্দান	খান্‌দান
	দান্দান	দান্‌দান
	জিন্দান	জিন্‌দান
	আন্দাজ	আন্‌দাজ

	আন্দেসা	আন্‌দেসা
	বন্দী	বোন্‌দী
	বন্দেগী	বোন্‌দেগী
	কুন্দুজ	কুন্‌দুজ
	জিন্দা	জিন্‌দা
	হিন্দু	হিন্‌দু
১.১৩. বন্ধ (ন্‌ধ)	সিন্ধু	সিন্‌ধু
	গন্ধম	গন্‌ধম
১.১৪. ন্ন (ন্‌ন)	খান্নাছ	খান্‌নাছ
	ইন্নাছ	ইন্‌নাছ
	জিন্নাহ্	জিন্‌নাহ
	মান্না	মান্‌না
	হান্নান	হান্‌নান
	সিন্নি	সিন্‌নি
	মিন্নতি	মিন্‌নতি
	রহিমুন্নেছা	রহিমুন্‌নেছা
	করিমুন্নেছা	করিমুন্‌নেছা
১.১৫. প্প (প্‌প)	খাপ্পা	খাপ্‌পা
	ছাপ্পা	ছাপ্‌পা
	ধাপ্পা	ধাপ্‌পা
১.১৬. প্ত (প্‌ত)	রপ্ত	রপ্‌তো
	হপ্ত	হপ্‌তো
	হপ্তা	হপ্‌তা
	গ্রেপ্তার	গেরেপ্‌তার
	দপ্তর	দপ্‌তর
	ইপ্তার	ইপ্‌তার
	মুপ্তি	মুপ্‌তি
	রপ্তানী	রপ্‌তানী
	গুপ্তাগু	গুপ্‌তাগু
	আপ্তাব	আপ্‌তাব

১.১৭. স্ত (স্‌ত)	ইস্তফা	ইচ্‌তফা
	মুস্তাফা	মুচ্‌তাফা
	খাস্তগীর	খাচ্‌তগীর
	দস্ত-ব-দস্ত	দচ্‌ত-ব-দচ্‌ত
	আস্ত	আচ্‌ত
	নিস্ত	নিচ্‌ত
	ইস্তক	ইচ্‌তক
	মাস্তান	মাচ্‌তান
	মুস্তাফিজ	মুচ্‌তাফিজ
	কিস্তী	কিচ্‌তী
	বেহেস্ত	বেহেশ্‌ত
	গোস্ত	গোশ্‌তো
	দস্তখৎ	দচ্‌তোখৎ
	বুস্তা	বুচ্‌তা

বলা দরকার, এভাবে সহজ সরল আরবী-ফারছী ও উরদু শব্দকে অদরকারী, দৃষ্টিকটু, যুক্তাক্ষরের মাধ্যমে লেখার যে-তরতিব শেখানো হ'য়েছে; তার বদলে পূর্বতন ঐতিহ্য অনুযায়ী অযুক্তবর্ণে লেখার ধারা বজায় রাখলে—বাঙালা লেখা ও পড়া খুব-ই সহজ হ'ত। কিন্তু তা না ক'রে বানানের চলমান ধারার ব্যতিক্রম ঘটিয়ে, কেবল প্রচলিত শব্দের মূল বানান ও উচ্চারণ-রীতির প্রবহমান ইতিহাস-ঐতিহ্যকেই মিছমার করা হয়নি; সেই সাথে মুছলমানদের ভাষা-চেতনা, বানান-চেতনা এবং উচ্চারণ-রীতিও হারিয়ে গেছে। ফলে, সামগ্রিক ভাবে বাঙালা ভাষা ও সাহিত্য হ'য়ে উঠেছে—রূঢ়, কর্কশ এবং দৃষ্টি-কটু। অথচ এসব শব্দ যদি অযুক্ত বানানে লেখা হ'ত—তা হ'লে—তা আজকের কম্পিউটারের যুগে অত্যাধুনিক ভাষা ব'লে, গণ্য হ'ত।

কিন্তু সে-দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে—ব্রাহ্মণ্যবাদী বাঙালী বিদ্বান ও তাঁদের অসচেতন অনুসারীগণ ঐ কাজ ক'রেছেন—বাঙালা ভাষার সার্বদৌহিক 'অক্ষরমূর্তি দ্বারা 'শব্দমূর্তি' গ'ড়ে তোলার অভিপ্রায়ে। ভাষাকে ধর্মীয় চেতনার বেড়াজালে আটকাবার খাহেসেই তাঁরা বাঙালায় আনীত সংস্কৃত অক্ষর, শব্দ ও লেখন-রীতি দিয়ে 'অক্ষর-মূর্তি' ও 'শব্দ-মূর্তি' নির্মাণ করেন। ফলে, তাঁরা পূর্বোক্ত রকম যুক্তাক্ষরের সাথে আরও যে-সব লেখন-শিল্পের জন্ম দেন, তার মধ্যে রেফ্, র-ফলা ও অন্যান্য ফলার (মোট ৭টি ফলা) কথাও বলা যায়। ঐ সব পণ্ডিত কেবল স্থান-বিশেষে 'ল' স্থানে

'র' লেখার নিয়ম চালু করেননি; তার সাথে, এক-ই র-হরফের তিন রকম মূর্তিও নির্মাণ ক'রে—তা ভাষার বুকে পুঁতে দিয়েছেন।

অনেকেই জানেন, ধর্মপরায়ণ হিন্দু-চেতনায় মূর্তি—'বস্তু' ও 'অবস্তু'ভেদে দু'রকম।—ভাবমূর্তি ও বস্তুমূর্তি। 'ভাবমূর্তি', তিন রকম—'চিন্ময় মূর্তি', 'অক্ষরমূর্তি' ও 'শব্দমূর্তি' বা 'ভাষা-মূর্তি'। 'বস্তুমূর্তি' আবার বস্তুভেদে প্রধানতঃ তিন রকম। 'মৃন্ময় মূর্তি' বা মাটির মূর্তি, 'দারুমূর্তি' বা কাষ্ঠনির্মিত মূর্তি ও প্রস্তর মূর্তি' বা পাথুরে মূর্তি। শেষোক্ত মূর্তি—দু'শ্রেণীর—'দেবমূর্তি' (পুরুষ) ও 'দেবীমূর্তি' (নারী)। তাছাড়া আছে—'অসুরমূর্তি' প্রভৃতিও।

এসব বিচিত্র মূর্তি-চেতনাই হিন্দু-চেতনার বৈশিষ্ট্য। 'অক্ষরমূর্তি', 'শব্দমূর্তি' (ভাষা-মূর্তি) ও 'ভাবমূর্তি'—তান্ত্রিকদের আদ্যাদেবীর-ই নানাবিধ রূপায়ণ (Manifestation) রূপে স্বীকৃত। তন্ত্র-গ্রন্থাদিতে এসবের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। বাঙালা বর্ণমালা ও ভাষার ওপর যতদিন হিন্দুদের ধর্মীয় মূর্তি-চেতনার, বিশেষ ক'রে 'অক্ষরমূর্তি' ও 'শব্দমূর্তি' নির্মাণের আছর পড়েনি; ততদিন বাঙালা অক্ষর ও শব্দরূপ জটিল-কঠিন এবং কিম্ভূতকিমাকার হয়নি। বৃটিশপূর্ব আমলে লিখিত বাঙালা দলিলাদি-ই তার নজীর। বৃটিশ-আমলে নব ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরুত্থানের সময় হিন্দুরা বাঙালা ভাষাকে সংস্কৃতায়িত বা মূর্তিমন্ত করার পর, বাঙালায় ব্যবহৃত আরবী ফারছী ও উরদু শব্দের দিকেও নজর দেন এবং এক-ই ভাবে সেগুলোরও সংস্কৃতায়ন ঘটান। ফলে, আরবী, ফারছী ও উরদু ভাষায় অভিজ্ঞ মুসলমানরাও ঐ সব শব্দ লেখেন-বলেন সংস্কৃতায়িত বা বিকৃত রূপে। নজীর হিসেবে নিচের আলোচনার দিকে নজর আকর্ষণ করা যায়। যথা—

২. অকারণ রেফ্-র (র্) ব্যবহার—

রেফ-র যুক্ত বর্ণ	**লিখিত শব্দরূপ**	**উচ্চারিত শব্দরূপ**
২.১. র্জ (র্জ)	তর্জমা	তর্‌জমা
	মর্জিনা	মর্‌জিনা
	দর্জি	দর্‌জি
	কর্জ	কর্‌জো
	বর্জখ	বর্‌জোখ
	দর্জাল	দর্‌জাল

	দর্জা	দর্‌জা
	মীর্জা	মীর্‌জা
	মের্জাই	মের্‌জাই
	কার্জাই	কার্‌জাই
২.২. র্ক (র্‌ক)	জির্কা	জির্‌কা
	তুর্ক	তুর্‌ক
	তুর্কী	তুর্‌কী
	তুর্কান	তুর্‌কান
	সির্কা	ছির্‌কা
	ফির্কা	ফির্‌কা
	হর্কৎ	হর্‌কৎ
	মর্কত	মর্‌কত
২.৩. র্গ (র্‌গ)	বর্গা	বর্‌গা
	দর্গা	দর্‌গা
	হর্গেজ	হর্‌গেজ
	জির্গা	জির্‌গা
	মুর্গী	মুর্‌গী
	সের্গাই	সের্‌গাই
	মার্গব	মার্‌গুব
	জার্গাম	জার্‌গাম
২.৪. র্ছ (র্‌ছ)	কুর্ছি	কুর্‌ছি
	মুর্ছালিন	মুর্‌ছালিন
	ফুর্ছৎ	ফুর্‌ছৎ
	দর্ছে	দর্‌ছে
	তের্ছা	তের্‌ছা
	আর্ছা	আর্‌ছা
২.৫. র্ত (র্‌ত)	মুর্তাদ	মুর্‌তাদ
	শর্তাজ	শর্‌তাজ
	মুর্তাজা	মুর্‌তাজা
	কুর্তা	কুর্‌তা

	বর্তন	বর্‌তন
	ফুর্তি	ফুর্‌তি
	মর্তবা	মর্‌তবা
	বর্তনিয়া	বর্‌তনিয়া
২.৬. র্দ (র্‌দ)	ফর্দ	ফর্‌দো
	গর্দান	গর্‌দান
	সর্দার	সর্‌দার
	হর্দম	হর্‌দম
	পর্দা	পর্‌দা
	সর্দা	সর্‌দা
	মর্দা	মর্‌দা
	বুর্দা	বুর্‌দা
	গুর্দা	গুর্‌দা
	উর্দু	উর্‌দু

এসব শব্দ বৃটিশ-পূর্ব আমলে রেফ্-যুক্ত ছিল না।

৩. অকারণ ফলা-ব্যবহার —

এর পর আরবী, ফারছী ও উরদু শব্দে অকারণ র-ফলা যুক্ত ক'রে যে-সব শব্দের বানান—সংস্কৃতায়িত ক'রে লেখন ও উচ্চারণ জটিল-কঠিন করা হ'য়েছে—তার কয়েকটি নমুনা নিচেয় দেয়া হ'ল। যথা —

৩.১. ব-ফলাযুক্ত	**লিখিত শব্দরূপ**	**উচ্চারিত শব্দরূপ**
১.ক. শব্দান্তে ব্ব-ফলা —		
ব-য়ব-ফলা (ব্‌ব)	আব্বা	আব্‌বা
	জুব্বা	জুব্‌বা
	তিব্ব	তিব্‌বো
	তিব্বী	তিব্‌বী
	রাব্বি	রাব্‌বি
খ. শব্দ-মধ্যে ব্ব-ফলা —	বব্বর	বব্‌বর
	জব্বার	জব্‌বার

	দাব্বাত	দাব্‌বাত
	শাব্বির	শাব্‌বির
	মুতাকাব্বির	মুতাকাব্‌বির
	মাতব্বর	মাতব্‌বর
	মোদাব্বের	মোদাব্‌বের
গ. শব্দ মধ্যে ব্ল (ব্‌ল)	ইব্লিছ	ইব্‌লিছ

৩.২. ম-য় ম-ফলা ম্ম (ম্‌ম)	**শব্দান্তে লিখিত রূপ**	**উচ্চারিত রূপ**
২-ক. শব্দান্তে ম-ফলা	আম্মা	আম্‌মা
	আম্মি	আম্‌মি
	আম্মু	আম্‌মু
	জুম্মা	জুম্‌মা
	জিম্মা	জিম্‌মা
	জিম্মি	জিম্‌মি
	ছুম্মা	ছুম্‌মা
খ. শব্দমধ্যে ম-ফলা	**লিখিত শব্দ রূপ**	**উচ্চারিত শব্দরূপ**
	জুম্মার	জুম্‌মার
	হিম্মৎ	হিম্‌মৎ
	মুহাম্মদ	মুহাম্‌মদ
	আহাম্মক	আহাম্‌মক
	জিম্মাদার	জিম্‌মাদার
	জুম্মাবার	জুম্‌মাবার
	আম্মান	আম্‌মান
	জিম্মিগণ	জিম্‌মিগণ

৩.৩. য-ফলা (্য) (্য=ইয়)	**লিখিত শব্দ রূপ**	**উচ্চারিত শব্দ রূপ**
ব-য় য-ফলা (ব্য)	আরব্য	আরোব্‌বো
৩.৪. স্য (স্+্য)	পারস্য	পারোস্‌সো

		হিস্যা	হিস্‌সা
৩.৫. র-ফলা (্র)		আক্রাম খাঁ	আক্‌রাম খাঁ
৫.ক	ক্র (ক্+র)	ফতেপুর সিক্রি	ফতেপুর সিক্‌রী
		ডিক্রীজারী	ডিক্‌রী জারী
		বক্রী	বোক্‌রি
খ.	দ্র (দ্+র)	ইদ্রিছ	ইদ্‌রিছ
		ইদ্রাকপুর	ইদ্‌রাকপুর
		মাদ্রাসা	মাদ্‌রাছা
		মাদ্রিদ	মাদ্‌রিদ
		মাদ্রাজ	মাদ্‌রাজ
		হাদ্রামাউত	হাদ্‌রামাউত
গ.	ফ্র (ফ্+র)	কাফ্রী	কাফ্‌রী
		আফ্রিকা	আফ্‌রিকা
		আফ্রিদী	আফ্‌রিদী
		আফ্রা	আফ্‌রা
ঘ.	ব্র (ব্+র)	ইব্রাহীম	ইব্‌রাহীম
		ইব্রানী	ইব্‌রানী
		হিব্রু	হিব্‌রু
		জেব্রা	জেব্‌রা
		সেব্রানিসা	ছেব্‌রানিছা
ঙ.	শ্র (শ্+র)	মিশ্রী	মিছ্‌রী
		আশ্রাফ	আশ্‌রাফ
চ.	স্র (স্+র)	ইস্রাফিল	ইছ্‌রাফিল
		ইস্রাইল	ইছ্‌রাইল
		ইস্রাকোল	ইছ্‌রাকোল
		খস্রু	খস্‌রু
		ইয়াস্রেব	ইয়াছ্‌ছেরেব
		ইস্রাকোল	ইছ্‌রাকোল

এবার বাঙালায় লিখিত ল-ফলার দিকে নজর দেয়া দরকার। বাঙালা ভাষায় যে-সব ফলার চলন আছে, তার মধ্যে ল্ল-ফলা ভিন্ন অপর সকল ল-ফলাই অদরকারী।

বাঙালা ভাষা যত দিন সংস্কৃত শব্দে ভ'রে ওঠেনি; ততদিন ল-ফলারও আধিক্য দেখা দেয়নি। এ-কারণে ফারছী-বাঙালায় কেবল শব্দান্তে ল-এর দ্বিত্ব অবস্থিতিকে সহজ উচ্চারণের খাতিরে ফলা-আকারে লেখা হ'ত। যেমন আল্লা, মোল্লা, কল্লা, দরিবুল্লা, তরিবুল্লা; কলিমুল্লা, রছুলুল্লা ইত্যাদি।

কিন্তু এরকম সব শব্দসহ অপরাপর আরবী-ফারছী ও উরদু শব্দে,বিশেষ ক'রে শব্দান্ত ও শব্দ মধ্যস্থ ল-এর দ্বিত্ব অবস্থিতি উচ্চারণ-সম্মত ছিলনা। ঐ সব স্থানে শব্দ-লেখনে সংকোচন ঘটাতে সংস্কৃতের অনুরূপ ল্ল -ফলা লিখিতে হ'লেও উচ্চারণ কালে তা বিবৃত হ'য়ে প'ড়ত বা ছড়িয়ে যেত। এখনো তা হ'য়ে থাকে। যেমন—বিল্লাল, ছাল্লাল্লাহু, জাল্লাল ইত্যাদি। নিচেয় এগুলো ব্যাখ্যামূলক ভাবে দেখানো হ'ল—

৩.৬- ল্ল-ফলা (ল্‌ল)	**লিখিত শব্দরূপ**	**উচ্চারিত শব্দরূপ**
৬.ক. শব্দান্তে ল্ল-ফলা	আল্লা	আল্‌লা
	বিল্লা	বিল্‌লা
	কল্লা	কল্‌লা
	মোল্লা	মোল্‌লা
	চিল্লা	চিল্‌লা
	জেল্লা	জেল্‌লা
	কেল্লা	কেল্‌লা
	হিল্লা	হিল্‌লা
খ. শব্দ-মধ্যে ল্ল-ফলা —	বিল্লাল	বিল্‌লাল
	জাল্লাল	জাল্‌লাল
	ইল্লাল্লা	ইল্‌লাল্‌লা
	ছাল্লাল্লাহু	ছাল্‌লাল্‌লাহু
	কুল্লাহু	কুল্‌লাহু
	জিল্লুল্লা	জিল্‌লুল্‌লা
	মুয়াল্লিম	মুয়াল্‌লিম
	মুবাল্লিগ	মুবাল্‌লিগ
	তাখাল্লুছ	তাখাল্‌লুছ
	নছরুল্লাহ	নছরুল্‌লাহ্
৩.৭. শ্ব-ফলা—	মোবাশ্বের	মোবাশ্‌শের

(শ্ব)

৩.৮- স্ব-ফলা — (স্ব) শব্দের আদিতে,মধ্যে ও অন্তে স্ব-(স্ব) ফলা	লিখিত শব্দ রূপ	উচ্চারিত শব্দ রূপ
	স্বূফী/সূফী	ছুফী
	মফঃস্বল	মফশ্‌শল
	নিস্বা	নিশ্‌সা

এরকম অকারণ ফলা তৈরী ও তা আরবী, ফারছী ও উরদু শব্দের গায়ে বসিয়ে দেয়াতে এখনকার লেখক-পাঠকরা কোন্‌টা ম্ম -ফলা(ম্‌+ম) আর কোন্‌টা ন্ন -ফলা (ম্‌+ন) অথবা ন্ম -ফলা (ন্‌+ম) তা বুঝতে হিমসিম খায়। তারা 'ফলা' ও 'সংযুক্ত হরফে'রও ভেদ ক'রতে পারে না। তাই লিখতে এবং ব'লতেও পারে না। অথচ ফলা বাদ দিয়ে লিখলে বহু শব্দ লেখা-বলা-বোঝা ও উচ্চারণ করা খুব-ই সহজ হ'ত।[২৩] 'আম্মা' আর 'আম্না' একাকার হবার প্রশ্ন উঠত না। (সম্মানকে কেউ সন্‌মান ব'লত না।)

অকারণ অনুস্বার, বিসর্গ ও চন্দ্রবিন্দু সংযোগ

এবার আরবী-ফারছী শব্দের অকারণে অনুস্বার-বিসর্গ যোগ করার কথাও বলা যেতে পারে। সবাই জানেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ব'লেছেন—"অনুস্বারের উচ্চারণ বাঙালায় নেই"। তথাপি এই সংস্কৃত লিপি-চিহ্ন-(আসলে এটি একটি মন্ত্র-চিহ্ন) টি বাঙালীর কলমে ধরিয়ে দেয়া হ'য়েছে। ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হ'য়েছে। জিহ্বা যা-ই বলুক; হাতকে লিখতে হ'চ্ছে, যে-রকম শিখিয়ে দেয়া হ'য়েছে—সে রকম-ই । আর তা কেবল সংস্কৃত ভাষার শব্দের বেলায় নয়; আরবী, ফারছী শব্দের ক্ষেত্রেও । এর ফলে, খোদ্ "বাঙ্গালা" বা 'বাঙালা' শব্দটিও নির্ভূল ভাবে না লিখে, লেখা হ'চ্ছে "বাংলা" রূপ ভুল বানানে।

এতরফে আরও বলা দরকার যে, বৃটিশ-পূর্ব আমলে, বাঙালীর মূল ধারার বাঙালা সাহিত্যে (পুথি- কেতাবে) অনুস্বার, বিসর্গ ও চন্দ্রবিন্দুর কোন স্থান ছিল না। তখন "বাংলা"কে লেখা হ'ত—"বাঙ্গালা"; "রং 'কে লেখা হ'ত—'রঙ (এই বানানটি রবীন্দ্রনাথও ব্যবহার ক'রেছেন।), "চাঁদ" কে লেখা হ'ত—'চাদ', "পাঁচ"কে লেখা হ'ত—"পাচ", "খোঁড়া"কে লেখা হ'ত—"খোড়া" ইত্যাদি। সে-আমলে "দুঃখ" লেখার বদলে, লেখা হ'ত—"দুখ"। " প্রথমতঃ," "দ্বিতীয়তঃ", "সাধারণতঃ", "ক্রমশঃ" ইত্যাদি লেখারও কোন বালাই ছিল না।

যা হোক, এমনি ভাবে বাঙালা ভাষা, বানান ও উচ্চারণকে সংস্কৃতায়িত করার সাথে সাথে বাঙালায় প্রচলিত আরবী, ফারছী, উরদু ও অপরাপর বিদেশী শব্দের

২২. আরবী, ফারছী ও উরদু শব্দের বাঙালা রূপায়ণে, ণ-ফলা ও ন-ফলার কোন নজীর নেই

সংস্কৃতায়ন ঘটাবার ফলে—ঐ সব শব্দের বানান ও উচ্চারণকেই কেবল জটিল ক'রে তোলা হয়নি; সেই সাথে কোটি কোটি শিক্ষিত বাঙালীকেও পুরুষানুক্রমিক ভাবে নিজের নাম ও আরবী, ফারছী, উরদু, হিন্দী শব্দ সঠিক ভাবে লেখা, বলা কঠিন ক'রে তোলা হ'য়েছে। তার ফলে, কেবল আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরাই নন; ইছলামী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরাও সংস্কৃত-বাঙালার প্রভাবে আক্রান্ত হ'য়ে, দিন দিন ভুলের পরিমাণ কেবল বাড়িয়েই চ'লেছেন। এমন কি, যাঁরা পাশ্চাত্ত্য এবং ইছলামী—এই উভয় ধারার শিক্ষায় সুশিক্ষিত; তাঁরাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই জটিলতা ও ভুলের শিকার না হ'য়ে পারেননি এবং পারছেন না। তাই অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিও আজ লেখেন —

'আবদুল আলী'র	বদলে	আব্দুলালী
'আছমত আলী'র	বদলে	আছমতালী/আসমতালী
'হাসেম আলী'র	বদলে	হাশেমালী/হাসেমালী
'কাছেম আলী'র	বদলে	কাছেমালী/কাসেমালী
'মনতাজ আলীর	বদলে	'মন্তাজালি/মোন্তাজালী
'জছিম উদ্‌দীন-এর	বদলে	জসীমুদ্দীন ।
'হামিদ উদ্‌দীন-এর	বদলে	হামিদুদ্দীন।'[১] ইত্যাদি।

এরকম সব শব্দ বা নাম—ভুল ক'রে লেখার কারণ কেবল বাঙালা ভাষায় ব্যবহৃত আরবী, ফারছী শব্দের বানান-সংস্কৃতায়ন নয়; সেই সঙ্গে বাঙালা ভাষার ওপর সংস্কৃত ব্যাকরণেরও প্রভাব। নির্দিষ্ট রূপে এ- প্রভাবকে বাঙালায় প্রচলিত সংস্কৃত সন্ধিযুক্ত হিন্দু নামের প্রভাব বলা যায়। আর সেই সাথে ঐ সব মুছলিম নামশব্দ যে-আরবী-ফারছী ভাষাতত্ত্বিক নিয়মের অধীন, তার মূল রূপ সম্পর্কে অজ্ঞতা বা অসচেতনতা। তা সংস্কৃত সন্ধিজাত হিন্দু নাম ও অপরাপর শব্দের নজীর দিলে দেখা যায়। যেমন গিরি+ইন্দ্র=গিরীন্দ্র, দেব +ইন্দ্র=দেবেন্দ্র , কবি+ইন্দ্র=কবীন্দ্র, মহী+ইন্দ্র=মহীন্দ্র, রবি+ইন্দ্র=রবীন্দ্র জীব+ইন্দ্র=জীবেন্দ্র ইত্যাদির প্রভাবে প্রচুর আরবী-ফারছী নাম-শব্দ ও অন্যান্য শব্দ বিকৃত হ'য়ে প'ড়েছে। এরকম সব সন্ধিযুক্ত নামশব্দ বাঙালার অমুছলিম সমাজে বেশুমার পাওয়া যায়। বলা দরকার, ঐ সব নাম-শব্দের সাথে মুছলিম নামশব্দের ফারাক আছে। সে ফারাক শব্দ-গঠনে ব্যাকরণ-বিধির ফারাক। ভাষাতাত্ত্বিক নিয়মের ফারাক। আরবী ও সংস্কৃত এই দু'ধরনের শব্দের দু'রকম অর্থ ও তাৎপর্যেরও ফারাক। বিষয়টা আরও খোলাছা ~~ক'রে ব'ললে~~ ব'লতে হয় যে—গিরি+ইন্দ্র=গিরীন্দ্র। তার অর্থ—গিরির ইন্দ্র;

২৩. একেবারে হালে এ-সব শব্দের ঈ-কার—হ্রস্ব-ইকারে ব'দলে দেয়া হ'য়েছে।

'ইন্দ্রের গিরি' নয়। দেব +ইন্দ্র =দেবেন্দ্র, অর্থ—দেবতার মধ্যে ইন্দ্র (সদৃশ); 'ইন্দ্রের দেব' নয়। কবি+ইন্দ্র=কবীন্দ্র হ'ল—কবিদের মধ্যে ইন্দ্র (তুল্য); 'ইন্দ্রের কবি' নয়। ইত্যাদি। অন্যদিকে, আরবী, ফারছী মুছলিম নামগুলো এমন নয়। বরং এর পুরোপুরি বিপরীত। যেমন আবদুল্লাহ্। এ-শব্দের আপাতঃ নজরে দুটো অংশ। যথা–আবদ্ ও 'আল্লাহ্'। 'আবদ্' শব্দটি তৎসম (আরবী মূল শব্দরূপ 'আবদুন্''। অর্থ 'দাস'। আর আল্লাহ্ অর্থ মালিক, স্রষ্টা বা প্রভু। 'আবদুন্'+ 'আল্লাহ্' এই দুটো অংশ যোগ ক'রে—'আবদুল্লাহ্' হ'য়েছে। তার অর্থ কিন্তু—'আল্লাহ্র দাস'। 'দাসের আল্লাহ্' নয়।

এবিষয়ে আরও সচেতন থাকা দরকার যে, নামটি আবদ্+আল্লাহ্= আব্দাল্লাহ্ বা আব্দাল্লাহ্ হ'তে পারে না। কারণ আল্লাহ্ শব্দের সাথে সম্পর্কিত হ'য়েছে—''আবদুন্'' শব্দ; 'আবদ্' শব্দটি নয়। আবদুল্লাহ্ শব্দে তাই' 'আবদুন্'-এর 'উন্' ধ্বনির সাথে পরবর্তী আল্লাহ্ শব্দের 'আল্ (প্রথমাংশের) ধ্বনি যুক্ত হ'য়ে 'উন্'- এর 'উ' ও 'আল্' এর 'ল' ধ্বনি মিলে হ'য়েছে 'উল্'–ধ্বনি গঠিত; যা আবদুন্-এর 'দ'–এর সাথে উ-কার রূপে যুক্ত হ'য়ে আবদুল্লাহ্-র সৃষ্টি ক'রেছে। আবদুন্ + আল্লাহ্ হ'য়েছে—আব্দুল্লাহ্ বা আব্দুল্লাহ্।

মুছলিম নাম–শব্দের আরবী ব্যাকরণগত বিশেষত্ব

এই রচনার শুরুর দিকে বলা হ'য়েছে যে, বাঙালার মুছলিম নামশব্দে আরবী ব্যাকরণের একটি ভাষাতাত্ত্বিক ভূমিকা আছে। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সে-বিষয়ে আলোকপাত করেননি। তা হ'ল— আরবী ব্যাকরণে শব্দ-গঠন-প্রক্রিয়ায় 'হরফে শামছী' ও 'হরফে কামারী'র দু'রকম ভূমিকা বিদ্যমান। মুসলিম নাম-শব্দ ও অপরাপর শব্দ-গঠনে 'হরফে শামছী' ও হরফের কামারী'র এই ভূমিকার কারণে যে- পরিবর্তন ঘটে, তা এরূপ—

ক. হরফে শামছীর কারণে আরবী নাম-শব্দের রূপ দাঁড়ায় এ-রকম—

১. আবদুন্+ আল্ নবী	=	আবদুন্নবী
২. আবদুন্ + আল্ ছামাদ	=	আবদুচ্ছামাদ
৩. আকিকুন্ + আল্ নিছা	=	আকিকুন্নিছা
৪. হাবিবুন্ + আল্ নাহার	=	হাবিবুন্নাহার
৫. কারিমুন্ + আল্ নিছা	=	করিমুন্নিছা ইত্যাদি।

খ. অনুরূপ ভাবে 'হরফে কামারী'র কারণে আরবী নাম-শব্দের রূপ দাঁড়ায় এ-রকম—

১. শাহীদুন্ + আল্ ইছলাম = শহীদুল ইছলাম
২. কাবিরুন্ + আল্ ইছলাম = কবিরুল ইছলাম
৩. আবদুন্ + আল্ করিম = আবদুল করীম
৪. বাদরুন্ + আল্ আলম = বদরুল আলম
৫. নাজিবুন্ + আল্ বাসার = নজিবুল বাসার ইত্যাদি।

এই দু'কিছিমের মধ্যে পহেলা শ্রেণীর নাম–শব্দের সম্বন্ধকৃত কর্তৃকারকের চিহ্ন উন্, উর্, উশ্, ইত্যাদি। আর পরবর্তী শ্রেণীর ক্ষেত্রে তা—আল্,উল্, ইত্যাদি। বলা দরকার যে, আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী মুছলিম নাম-শব্দে সম্বন্ধকৃত পদের সম্বন্ধ কারকের চিহ্ন হয় পেশ ( ) বা 'উ'। আর ফারছীতে বা ফারছী ব্যাকরণ অনুসারে তা হয় ইয়া/জের বা ই/এ। যথা—

১. ফজল + ই/ এ খোদা = ফজ্‌লে খোদা
২. মাহ্ + ই/ এ রমজান = মাহে রমজান
৩. শাহ্ + ই/ এ বাঙাল = শাহে বাঙাল
৫. নহর + ই/ এ জোবায়দা = নহ্‌রে জোবায়দা। ইত্যাদি।

মুছলিম আরবী , ফারছী নামশব্দের এসব বিশেষত্ব নিয়ে ড. চট্টোপাধ্যায় কিছু মাত্র আলোচনা করেননি। অথবা মুছলমানদের শুদ্ধ নাম রাখার জন্য আরবী ব্যাকরণের এই বিশেষেত্বটুকু ধরিয়ে দেওয়ারও কোন কোশেশ করেননি।

পরিশেষে বলা দরকার, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পূর্বোক্ত বক্তব্যে আরবী, ফারছী এবং উরদু হরফের বাঙালায় রূপান্তর সম্পর্কে যে-'নববিধান' প্রচারিত হ'য়েছে—তা অত্যন্ত অসংগত; তথ্য ও যুক্তির বিরোধী। তাঁর প্রত্যেকটি 'তথ্য' ও 'যুক্তি' বিশ্লেষণ ক'রে দেখা গিয়েছে যে, সে-গুলো আদৌ টিকসই নয়। তাই তাঁর 'সহজ পদ্ধতি'র 'নববিধান' বিশেষভাবে মুছলমানদের এবং সামগ্রিক ভাবে গোটা বাঙালী জাতির জাতীয় ভাষা-সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হ'য়েছে। এ-ক্ষতি পরিহারের জন্য গত পঞ্চাশ বছরেরও অধিককাল এ-দেশের সাহিত্যিক ও ভাষা-তত্ত্ববিদ্‌গণ যে-কোশেশ ক'রে আসছেন; তা খুব কম-ই সার্থকতা লাভ ক'রেছে। কারণ লিপি, শব্দ ও ভাষা-সংস্কৃতায়নের গোটা পরিধি ও তার পরিণতির প্রতি তাঁরা সম্যক দৃষ্টিদানে সমর্থ হননি। এজন্যেই আজও আমরা পূর্বোক্ত 'সহজ পদ্ধতি'র অতি কঠিন পরিণাম ভোগ ক'রে চ'লছি। এ-থেকে পরিত্রাণ লাভ কঠিন হ'লেও—অসম্ভব নয়।

রচনাকাল ঃ ১০-০৭-০৩